বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

GIFT

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

" নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অবদান"

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

কলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401853

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আ. ন. ম. আব্‌দুল মান্নান খান
এম. এম. (ঢাকা); বি.এ. অনার্স.
ডবল স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত;
এম. এ (ঢাকা); আধুনিক আরবী
বিশেষজ্ঞ (খার্তুম);
আধুনিক ফার্সী ডিপ্লোমা
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

ছাবিয়া খানম
এম.ফিল. রেজি ঃ নং-৪৪৩/৯৪-৯৫ইং
যোগদান ঃ ৩০-১২-৯৬ ইং
আরবী বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401853

ডিসেম্বর-২০০০ ইং

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম, ফিল গবেষক ছাবিয়া খানম কর্তৃক এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত ''নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অবদান'' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এম, ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম, ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

401853

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২০.১২.২০০০

আ, ন, ম, আবদুল মান্নান খান

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষনা দিচ্ছি যে, ''নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অবদান'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

ছাবিয়া খানম 20.12.2000
এম, ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ৪৪৩/ ১৯৯৪-৯৫

যোগদান ঃ ৩০/ ১২/ ৯৬ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা কার্যক্রমটি সমাপ্ত করার জন্য মহান আল্লাহতায়ালার কাছে অসংখ্য কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি হচ্ছেন নিখিল জাহানের প্রতিপালক। যার সাহায্য না থাকলে আমার গবেষণা কার্যক্রমটি সমাপ্ত করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

তারপর আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে সহযোগিতা করার জন্য যিনি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতার দাবীদার তিনি হচ্ছেন অত্র অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও শুভাকাংখী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আ, ন, ম আব্দুল মান্নান খান, যার অসংখ্য পরামর্শ ও অসম্ভব সাহায্যে আমার অভিসন্দর্ভটি পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এর পর যে সুধীজন আমার গবেষণার কাজে অমূল্য অবদান রেখেছেন তিনি হচ্ছেন সাবেক রাজস্ব উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ্ আবদুল হান্নান। তিনি আমাকে মূল্যবান উপদেশ এবং নানা ধরনের বই সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋনী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ রাজিয়া সুলতানা তার নিজস্ব গবেষণা কর্মের একখন্ড আমাকে গিফ্‌ট করে অনেক সাহায্য করেছেন। যার মাধ্যমে আমি অনেক দিক নিদের্শনা পেয়েছি। এছাড়া উনার স্বামী জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্দুল কাইয়ুম আমাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে বই দিয়ে নোট করতে সাহায্য সহ, সময়ে অসময়ে নানা রকম মূল্যবান উপদেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের আ, স, ম, আব্দুল্লাহ স্যারের কাছেও তার মূল্যবান উপদেশের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

401853

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা ফজলুল করীম ভাই আমাকে গবেষণার কাজে বই দিয়ে এবং কোন্ লাইব্রেরী থেকে কি রকম সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন যা পরিশোধ্য নয়। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এরপর আমার অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যে সমস্ত শুভাকাংখী বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তন্মধ্যে আমার স্বামী জনাব মোঃ মতিউর রহমানের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও সময়ে অসময়ে নানারকম পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে বলতে হয় তার সার্বিক সহযোগিতা না পেলে হয়তো গবেষণাটি আলোর মুখ দেখতে পেত কিনা সন্দেহ ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া যাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋনী তারা হচ্ছেন আমার বান্ধবী মহল যাদের ব্যাপক উৎসাহ প্রেরণা আমাকে একাজে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অফিস ষ্টাফ এবং রেজিষ্ট্রার দফতরে এম, ফিল শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক এবং বিভিন্ন কর্মচারীর সাহায্য ও সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

তারপর যাদের কথা এ মূহুর্তে স্মরণ না করে পারছিনা তারা হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা, মা। তাদের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ আমার অভিসন্দর্ভটি পরিসমাপ্তির পথে ইতি টানতে সক্ষম হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করি।

সর্বশেষে আমার পরিবারের একজন সদস্যার কথা স্মরণ করছি যে হচ্ছে আমার বাবুর দেখাশুনার দায়িত্বে ছিল। নাম তার ''আলোমতি,,। যে সার্বক্ষনিক আমার বাবুর দেখাশুনা করে গবেষণার কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আল্লাহ যেন আমার এ অভিসন্দর্ভটিকে কবুল করেন। আমীন।

গবেষক
ছাবিয়া খানম
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা ঃ-		৬-৯
প্রথম অধ্যায় ঃ-	''ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা''	১০
অনুচ্ছেদ নং ১।	শিক্ষা কি?	১১-১৩
২।	ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?	১৪-১৮
৩।	ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব।	১৯-২২
৪।	নারী শিক্ষায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ।	২৩-৩৮
৫।	ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজন কেন?	৩৯-৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-	''যুগে যুগে নারী শিক্ষার রূপ রেখা''	৫৫
অনুচ্ছেদ নং ১।	ইসলাম পূর্বযুগে নারী শিক্ষা।	৫৬-৭৭
২।	ইসলাম পরবর্তীযুগে নারী শিক্ষা।	৭৮-৮৭
৩।	মহিলা সাহাবীদের সময়ে নারী শিক্ষা।	৮৮-১০০
৪।	নারী শিক্ষায় হযরত আয়েশা রাঃ এর অবদান।	১০১-১২১
৫।	খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারী শিক্ষা।	১২২-১২৬
৬।	উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষা।	১২৭
৭।	আববাসীয় যুগে নারী শিক্ষা।	১২৮
৮।	মোগল আমলে নারী শিক্ষা।	১২৯-১৩৫
৯।	মধ্যযুগে বাংলায় নারী শিক্ষা।	১৩৬
১০।	আধুনিক যুগে বাংলায় নারী শিক্ষা।	১৩৭-১৪৬
তৃতীয় অধ্যায় ঃ-	নারী শিক্ষার বিভিন্ন অন্তরায় ও সমাধানের ইঙ্গিত।	১৪৭-১৫৩
উপসংহার		১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং দরুদ ও সালাম রাসূল (সাঃ) এর প্রতি যিনি মানবতার কল্যাণ সাধন তথা নারী জাতির মুক্তির জন্য পথনির্দেশিকা প্রদান করে গেছেন।

নারী সমস্যা আধুনিক ও প্রাচীন যুগের সমাজেরই সমস্যা। কেন না পরিসংখ্যানগতভাবে নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধেক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্মী, সন্তানাদি এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় তারা অর্ধেকেরও বেশী। এজন্য কবি বলেছেন -

''মা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
যখন তিনি পালন করেন তাঁর দায়িত্ব
তৈরী করেন জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন সুনহান ব্যক্তিত্ব''[১]

তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ও গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায় নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা। অন্যদিকে নারী হচ্ছে স্নেহ ভালবাসা ও আবেগের দিক দিয়ে সমাজের উৎকৃষ্টতম এবং সমস্যার বিচারে সমাজের জটিলতম সমস্যা। এ কারণে সকল যুগের চিন্তাবিদগণ নারীর সমস্যাকে গোটা সমাজের সমস্যা হিসেবে দেখেছেন ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।

বিগত তিনশো বছর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। এখন বলতে গেলে সর্বত্র প্রায় তার একচ্ছত্র রাজত্ব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিম দেশগুলোতেও কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী ছিল গৃহকোনে আবদ্ধ, পুরুষের সেবাদাসী, সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মোট কথা তাকে সবচেয়ে শোষিত বঞ্চিত ও নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবেই দেখা হতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লব ও ইউরোপের দেশগুলির বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারী গৃহ অংগনের বাইরে চলে আসে। তারা পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। পুরুষের আরোপিত বাধা নিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুরোপুরি নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার ফলে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। যার কারণে সংসার জীবনে ভাঙ্গন ধরে। যা ছিল পরিবারভিত্তিক ইসলামী ব্যবস্থার পরিপন্থী।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সমাজের এই ধ্বংস আজ আমাদের সমাজেও হয়েছে। প্রথমতঃ পাশ্চাত্যে দীর্ঘদিনের গোলামী মুসলিম বিশ্বের সর্বব্যাপী দারিদ্র এবং পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব আমাদের সমাজ অংগনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আমাদের সামাজেও চলছে পাশ্চাত্য ধারার সয়লাব। চোখ বন্ধ করে অন্ধের মত তাদের পিছনে চলছি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের সামাজিক বিধান থেকে আমাদের সমাজ বহুদূরে সরে এসেছে। এ সরে আসার কাজটা একদিনে সাধিত হয়নি। এজন্য আমাদের হাজার বছরের ভূমিকা দায়ী। কুরআন ও সুন্নাহ্ আমাদের যে সামাজিক বিধান নির্দেশ করেছে, রহমাতুল্লিল আলামীন (সাঃ) যে ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন এবং সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ তৎপরবর্তীকালের দু'তিনশো বছরের মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ যে স্বাভাবিক জাতিসম্পন্ন ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুশরিক জাতির সংস্পর্শে এসে তা থেকে ধীরে ধীরে আমরা দূরে সরে আসতে থাকি। বিশেষ করে আমাদের শাহী আমীর উমরাহ ও উচ্চ মহলে মুশরিকী রাজন্য ও উচ্চ বর্ণ প্রভাবিত একটি সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে। ''আননাসু আলা দীনি মুলুকিহিম''[২] জনতা হয় তাদের রাজার আচরনের অনুকারী। এই প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে সাধারন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজেও এ ধারা প্রসারিত হয়। এর ফলে তেরশো চৌদ্দশো বছর পরে আমাদের সমাজের মেয়েরা পার্শ্ববর্তী মুশরিকী ও পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজের মেয়েদের সাথে নিজেদের কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। এরা দেখে এরা পাশ্চাত্য নারীদের মত শোষিত, নিগৃহীত, পশ্চাদপদ অধিকার হারা তথা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আসল কথা ইসলামী সমাজ যে ধারায় অগ্রসর হয়েছিল, নবী করীম সঃ যে সরল স্বাভাবিক সামাজিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা কালক্রমে ব্যাহত হয়েছে। যার কারণে নারী সমাজের একরুন অবস্থা।

মুসলিম পুরুষ ও নারীর পারস্পারিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ইসলামী সমাজ। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন ঃ

... هن لباس لكم وانتم لباس لهن "

এখানে নারীকে পুরুষের বা পুরুষকে নারীর গোলামে পরিনত করা হয়নি। দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা দুনিয়াতেও স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং কেয়ামতেও আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে জবাব দিহি করার দায়িত্ব লাভ করবে। তাই পবিত্র কুর'আনে তাদেরকে - ''মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত'', ''কানিতীনা ওয়াল কানিতাত'', ''সাবিরীনা ওয়াস সাবিরাত'' ইত্যাদি পৃথক সত্তা সম্বলিত শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে। একজনকে অন্য জনের সহযোগী হিসাবে উপস্থাপনকরা হয়েছে। তাই বলা যায় ইসলামী সমাজে পুরুষ ও নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তাকে কোন ক্ষেত্রেও আহত করা হয়নি। পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও ইসলামী সামাজিকতার ফারাকটা এখানেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

বিগত কয়েকশো বছরে মুসলিম সমাজ পুরুষ শাসিত হওয়ার কারণে মুসলিম নারীর স্বাধীন সত্তা পুরাপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা নামাযের জামাতে পুরুষদের সাথে মসজিদে গিয়ে শরয়ী পদ্ধতিতে শামিল হতে পারছে না। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। অথচ যা হচ্ছে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য শরীয়াতের ফরজ। জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ নির্বিশেষে ফরজ হওয়া প্রসংগে জগতের মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সঃ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষনা করে গেছেন -

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة [৪] (ইবনে মাজা)

এই হাদীসে শিক্ষা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র পুরুষকে নির্দেশ করা হয়নি পুরুষের সাথে مسلمة শব্দ দ্বারা নারীকে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর জন্যেও ফরজ করা হয়েছে।

এছাড়া নারীরা মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ও জ্ঞানালোচনার জন্য বাইরে বের হতে পারছে না। অথচ শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে শরীয়ত নির্ধারিত পোশাকে আবৃত হয়ে ইসলামের যুগে তারা স্বচ্ছন্দে এসব কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম মেয়েরা এতে অক্ষম হবার কারণে তাদের একটি আত্ম সচেতন গোষ্ঠি ইসলামী বিধানকেই অকার্যকর ভাবতে শুরু করেছে, তারা পাশ্চাত্য-বাদের প্রতি ঝুকে পড়েছে। সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম দেশে এ প্রবণতা লক্ষনীয়। এ প্রবণতা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে এখন মুসলিম মেয়েরা ইসলামকে তাদের পথের বাধা মনে করতে শুরু করেছে। তাদের উপর আরোপিত ইসলামী বিধানের সমস্ত সীমারেখা ছিন্ন করে পাশ্চাত্যবাদকে তারা প্রগতি, অগ্রগতি ও নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিকাশের সহায়ক মনে করতে শুরু করেছে। অথচ আত্ম সচেতন মুসলিম মেয়েরা যদি একথা জানতো যে, ইসলাম তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা বিকাশের এবং তাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করার সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা দান করেছে তাহলে তারা আর পাশ্চাত্যবাদকে এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে অগ্রসর হতো না।

তবে মুসলিম আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একেবারে অসচেতন নন। তাদের একটি অংশ সমস্যাটিকে বাস্তবতার নিরিখে ক্ষতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন, যেটা মুসলিম নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের সমাজে নারী তথা মুসলিম নারীদের নানা রকম অধিকারসহ বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম যে তাদেরকে পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করার অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে তারা এখন পর্যন্ত ভাল করে জানে না। সমাজের বেশ খানিক অংশ এ রোগে রোগাক্রান্ত সে জন্য একজন শিক্ষিতা মুসলিম নারী হিসাবে নারী জাতির যৎসামান্য উপকার করার জন্য আমার এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ লেখার প্রয়াস।

সর্বোপরি যে জিনিসটা আমাকে এ বিষয়ে লেখার প্রেরনা যুগিয়েছে সেটা হচ্ছে - নানা ধরনের কুসংস্কারের বেড়াজালে নারী শিক্ষা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যেমন পারিবারিক, সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মীয় অজ্ঞতাসহ নানা ধরনের কুসংস্কার। আর এ সমস্ত নানা রকম জটিলতার কারনে তারা সমাজে তথা বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারছেনা। যার কারনে নারী সমাজকে এ সমস্ত কুসংস্কারের অক্টোপাস থেকে বের করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে পরিচয় করে দেয়াই আমার মূখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম নারীদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে কি দিয়েছে? এবং কি দিতে চায়? তদুপরি নারী শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? সে সম্পর্কে এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এ অভিসন্দর্ভে আমি সে সব দিক নিয়ে আলোচনা করেছি যা নিয়ে আমি সাধ্যমত গবেষণা চালিয়েছি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আশা করি ইন্‌শাল্লাহ আমার এ লেখনীমূলক উদ্যোগ মুসলিম নারী সমাজকে তাদের জ্ঞান অর্জনের পথের সমস্ত বাঁধাকে পদদলিত করে সামনে পথ চলার সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করবে। আল্লাহ এ উদ্যোগকে কবুল করুন।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা'' পৃষ্ঠা নং-১৭

২। আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা'' পৃষ্ঠা নং-২

৩। আল কুরআন- সূরা আল বাকারাহঃ ১৮৭ আয়াত।

৪। আল হাদীস জ্ঞান অধ্যায় ''ইবনে মাজা''।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ-

''ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা''

প্রথম অধ্যায় ঃ-

		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ নং ১।	শিক্ষা কি?	১১-১৩
২।	ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?	১৪-১৮
৩।	ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব।	১৯-২২
৪।	নারী শিক্ষায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ।	২৩-৩৮
৫।	ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজন কেন?	৩৯-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ-

''ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা''

অনুচ্ছেদ নং-১

শিক্ষা কি?

''নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অবদান'' সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে যে বিষয়গুলি আলোচনা করার প্রয়াস পাবো সেগুলি হচ্ছে শিক্ষা কি? ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব, ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজন কেন? নারী শিক্ষা প্রসংগে আলেম সমাজের কঠোর এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি কি ইত্যাদি প্রসংগে।

শিক্ষা কি?

শিক্ষা হল মনুষ্যত্বের বিকাশ। যেটা মানুষের জন্য কল্যানকর সেটা জানার নামই হল শিক্ষা। জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র, মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াসকে শিক্ষা বলে। শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে কবি John Milton বলেছেন "Education is the harmonius development of both body, mind and soul" অর্থাৎ শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ন উন্নতির নামই শিক্ষা। শরীর মন ও আত্মার সমন্বিত অগ্রগতি কোন আদর্শ (Ideology) ছাড়া যে হতে পারেনা তা একান্তভাবে সুস্পষ্ট। কোন এক মনীষী শিক্ষা প্রসংগে বলেছেন - ''জনশক্তির খাতে পুঁজি বিনিয়োগই শিক্ষা''।

ইসলামের দৃষ্টিতে চিরন্তন ও শাশ্বত নৈতিক মূল্যমানের ভিত্তিতে সত্য মিথ্যা ভালমন্দ নির্ধারনের ক্ষমতা অর্জন, পরিবেশের মুকাবিলার জন্য বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার নামই শিক্ষা। নবী ও রাসূলদের কাজ বর্ননা প্রসংগে আল্লাহ বলেন, তাদের কাজ হল মানুষকে কিতাব,হিকমা এবং পরিশুদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দান করা।

সর্বোপরি সর্বজ্ঞানের আধার আল্লাহতায়ালা মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি সামর্থদান করেছেন। শিক্ষা সেই জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তি বিকাশে যেমন সহায়তা করে তেমনি তা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি, রুচি, আচরন ও চরিত্রকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত ও উন্নত করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অজানাকে জানে। এ প্রসংগে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে -

" علم الانسان مالم يعلم ..."

অর্থাৎ ''মানুষ যা জানত না আল্লাহতায়ালা মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন।'' (সূরা আলাক-৫)

মোট কথা একজন আকৃতিগত মানুষকে গুনগত মানবন্ডে সঠিক মানুষ করার যাবতীয় প্রক্রিয়ার সমষ্টিই শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সমাজের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এমনকি জাতির মেরুদন্ড হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং কোন জাতি শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির আশা করতে পারেনা। সভ্যতা ও সম্মানের প্রথম ধাপই হলো শিক্ষা। ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ যেখানে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নবুওয়াতের সূত্রপাত হয়েছে জ্ঞানের প্রতি প্রবল তাকিদ দিয়ে, অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রথম বানীই ছিল -

"... اقرا باسم ربك الذى خلق

তাহলে দেখা যাচ্ছে اقرا (পড়) ঐশীগ্রন্থ আল কুর'আনের প্রথম শব্দ। মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসংগটি উল্লিখিত হয়েছে। কারণ শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরারূপে চিহ্নিত করে।

উল্লেখ্য যে - আল্লাহয়ালা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে সাথে সাথে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ প্রসংগে আল কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে।

''তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন সমস্ত কিছুর নাম। অতঃপর সেগুলো পেশ করলেন ফিরিশতাদের কাছে।''[৩] (সূরা বাকারা-৩১)

অর্থাৎ আদম আঃ ও ফিরিশতাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা হল। প্রতিযোগিতায় হযরত আদম (আঃ) বিজয়ী হলেন। ফলে তার মস্তকেই পরানো হল খেলাফতের মহামুকুট। তারপর আল্লাহপাক এরশাদ করেন ঃ

''হে আদম তুমি তোমার সংগিনীসহ জান্নাতে বসবাস কর''[৪] (সূরা বাকারা - ৩৫)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রনিধানযোগ্য যে, প্রথমে হয়েছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরেই হয়েছে জান্নাতে থাকার বন্দোবস্ত। এ থেকে বুঝাগেল—আল্লাহপাকের কাছে শিক্ষার মর্যাদাই অগ্রগন্য।

শিক্ষা আবার পদ্ধতিগতভাবে দুই ধরনের, এক ঃ মৌখিক শিক্ষা ও দুই ঃ কলম বা লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরা আলাকের শুরুতে اقرا শব্দের দ্বারা মৌখিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। আর ৪র্থ আয়াতে কলমের সাহায্যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাই পবিত্র কুর'আনের আলোকে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে পড়া এবং লেখা। এ প্রসংগে একটি হাদীসে বলা হয়েছে -

''আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর আরশে সংরক্ষিত আছে।''[৫] (কুরতবী)

শিক্ষা ব্যতীত মানুষ ও ইতর প্রাণীতে কোনই পার্থক্য নেই। মূলতঃ দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য যে শিক্ষা সেটা একটা হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যাবে। হাদীস শরীফে আছে -

''আল্লাহতায়ালা হযরত আদম আঃ এর পিঠের উপর প্রথম ডান হাত মারলে নেক সন্তানেরা বের হয় এবং পরে বাম হাত মারলে কুসন্তানেরা বের হয়। অতঃপর সকলকে (রুহসমূহকে) যারান নামক

Dhaka University Institutional Repository

উপত্যকায় একত্র করে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? উত্তরে সকলেই এক বাক্যে বলেছিল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক।''[৬] এর দ্বারাও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল শিক্ষা দেয়া। উল্লেখ্য যে, সারা দুনিয়াটাই হল একটা শিক্ষালয়। আর সমস্ত মানব এর ছাত্র এবং নবীগণ হলেন বিশেষ ছাত্র। আর আল্লাহতা'আলা হলেন বিশেষ শিক্ষক। তাই বলা যায় শিক্ষার গুরুত্ব এমন যা লিখে শেষ করা যায় না।

তথ্য সংগ্রহ ঃ-

১। আল কুর'আন- সূরা আলাক- আয়াত নং-৫

২। আল কুর'আন- সূরা আলাক- আয়াত নং-১

৩। আল কুর'আন- সূরা আল বাকারাহ- আয়াত নং-৩১

৪। আল কুর'আন- সূরা আল বাকারাহ- আয়াত নং-৩৫

৫। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- পৃষ্ঠা নং-১৪৬৬

৬। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা - পৃষ্ঠা নং-২

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং - ২

ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রইছউদ্দিন তার ইসলাম শিক্ষা বইয়ে ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন- ইসলাম শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ঃ (ক) ''মনুষ্যত্বের বিকাশ অর্থাৎ মানুষের মানবিক গুনাবলীর বিকাশ, (খ) মহান শ্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আত্ম পরিচিতি। (গ) খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা, (ঘ) সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন এবং (ঙ) অর্থ উপার্জন।''[১]

প্রথম উদ্দেশ্য ঃ-

মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ববোধ না থাকে তবে সে পশুর সমান। তাই মানবিক গুনাবলীর বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহপাক মানুষকে যে সম্মান দান করেছেন তা অবশ্যই অর্জন করা যায়; যথা ঃ

ولقد كرمنا بنيٓ ادم

অর্থাৎ ''নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে (মানবজাতিকে) সম্মান দান করেছি।''

যেহেতু মহাগ্রন্থ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের আলোকেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন ও আদর্শ চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যের অনুসারী হয়ে সম্মানের উপযুক্ত হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে শিক্ষা চরিত্র গঠনে ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক নয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা মূল্যহীন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

العلم بلا عمل كالجمل بلا حمل ٥

অর্থাৎ ''আমলবিহীন শিক্ষা বোঝাবিহীন উটের ন্যায়''। অর্থাৎ এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বোঝা বহনে অক্ষম উটের ন্যায় মূল্যহীন। অতএব প্রতিটি মানুষকে জ্ঞানার্জন করে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যমে হতে হবে মহৎ আদর্শবান। তা হলেই মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব সেটা সার্থক হবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঃ-

মহান শ্রষ্টার সন্তুষ্টিলাভ ও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন। মহান শ্রষ্টাকে রাব্বুল আলামীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিলাভের আশায় তারই দেয়া সত্য ও ন্যায়ের পথ সিরাতাল মুস্তাকীমে চলা। জ্ঞানই আলো, আর মূর্খতাই হল অন্ধকার। যথা ঃ "العلم نور والجهل ظلمة"

Dhaka University Institutional Repository

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আধার ও আলো কি সমান? কালামে পাকে আরও বলা হয়েছে ঃ

ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرًا كثيرا ٥

''যাকে হিকমাত অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে প্রকৃত কল্যাণ দেয়া হয়েছে।'' সূরা বাকারা (২৬৯)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান প্রভু পরওয়ার দিগারে আলম ঘোষনা করেছেন -

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٥

অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানুষকে আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

মুফাচ্ছিরীনদের মতে ليعبدون শব্দের ~~ليعرفون~~ অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষকে মহান স্রষ্টার সার্বিক পরিচয় লাভের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব মাহান স্রষ্টাকে সার্বিকভাবে জানতে হলে এবং সৃষ্টজীব হিসেবে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিজেকে জানা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাই বলা হয়েছে –

من عرف نفسه فقد عرف ربه

অর্থাৎ ''যে নিজকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভু পরওয়ারদিগারকে চিনতে পেরেছে।''

মহান স্রষ্টা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা,লালন-পালনকর্তা এবং শেষ বিচার দিনের একমাত্র বিচারক। আর মানুষ তারই সৃষ্ট জীবের মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠজীব আশরাফুল মাখলুকাত। যার কল্যানে নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুই নিয়োজিত যা মহান স্রষ্টার অপার করুনার নিদর্শন। সুতরাং মহান স্রষ্টার ইবাদত, তার মারেফাত, তার অপার করুনা রাশির যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। বিদ্যা মানুষকে একদিকে যেমন নিজের স্বরুপ সম্পর্কে অবহিত করে ঠিক তেমনি অপরদিকে এ বিজ্ঞান সৃষ্ট জগত সম্পর্কে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমনকি মহান প্রভুর অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ যা তিনি মানব কল্যানে দান করেছেন সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করে থাকে। ফলে তখনই জ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় এবং সে দিবালোকের ন্যায় মহান স্রষ্টার সকল নিদর্শনাদি সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর তখন থেকেই মহান স্রষ্টার সাথে সৃষ্টজীব হিসেবে তার নিগুঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভ সম্ভব হয়ে উঠে। তাই বলা হয়ে থাকে-যে প্রতিপালকের সন্ধান পেয়েছে সে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই পেয়েছে।

من له المولى فله الكل ٥

অর্থাৎ'' যে মহান প্রভুকে পেয়েছে সে সবই পেয়েছে''।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যা একটি ঘটনার মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হল-

''সালজুক রাজত্বের যুগে বাগদাদে মাদ্রাসায়ে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন শেখ তাকীউদ্দিন বাকীকুল ঈদ। কিছুদিন পর মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়্যাত পার্থিবতা ও দুনিয়া মুখী হয়ে গিয়েছে লক্ষ্য করে বাদশাহর ইচ্ছা হলো মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার কিন্তু শেষবারের মত যাচাই করার উদ্দেশ্যে তিনি কোন এক রাত্রিতে মাদ্রাসায় প্রবেশ করলেন এবং প্রত্যেক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, তুমি কোন উদ্দেশ্য মাদ্রাসায় পড়ছ? তাদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিল আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ আলিম, দেশে-বিদেশে তাঁর খুব নাম ডাক আছে। আমি এজন্যেই পড়ছি যেন লেখাপড়া শেষে তার মত সুনাম অর্জন করে খ্যাতি লাভ করতে পারি। অন্য একজন ছাত্র উত্তর করল আমার পিতা বাদশাহর কাজী, আমি এজন্য লেখাপড়া করছি যেন ভবিষ্যতে কাজী হতে পারি।

তারপর বাদশাহ নিযামুল মূলক দেখলেন, সকল ছাত্রের একই ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য কেবল জাগতিক চিন্তা। তাদের কারোর নিয়্যাত ভাল নয়। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। কেননা অনর্থক লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হচ্ছে অথচ সঠিক উদ্দেশ্য ও ভাল কোন নিয়্যাতে কেউ ইলম শিখছে না যার দ্বারা সওয়াব হাসিল হবে এবং আখিরাতের কল্যান হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার পর হঠাৎ বাদশাহর দৃষ্টি পড়ল একজন ছাত্রের উপর। সে অতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে শুধু কিতাবই পড়ছিল, বাদশা নিযামুল মূলক ছাত্রটির নিকট গেলেন, কিন্তু ছাত্রটি তার কিতাব থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মাথা উঠালো না। জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি তো বড়ই বেপরোয়া। উত্তরে ছেলেটি বললো, ''আমার তো একমাত্র উদ্দেশ্য হল কিতাব পাঠ করা,, কারো চেহারা দর্শন নয়।'' বাদশাহ তাকে বললেন, তোমার দু'এক মিনিট সময় নষ্ট হবে।: শুধু বলতো তোমার পড়ার উদ্দেশ্য কি? ছেলেটি তখন উত্তরে বললো, আমি আমার পিতা মাতার নিকট শুনেছি যে, আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি আমাদিগকে জীবন দান করেছেন এবং আমাদের উপর অত্যন্ত দয়া প্রদর্শন করেছেন। তার হকসমূহ আমার জানা নেই। এগুলো জানার জন্যই আমি শিক্ষার্জন করছি।''

বাদশাহ খুশী হয়ে বললেন, '' আমার ইচ্ছা ছিল, এ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া কিন্তু যতদিন এই ছাত্রটি এ মাদ্রাসায় পড়তে থাকবে ততদিন এ মাদ্রাসা চলতে থাকবে।'' এই ছাত্র ছিলেন মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রঃ)।''[২]

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল, ইলম শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও অপরের হক আদায় করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ঃ-

খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মহান প্রভুর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করে আদর্শ নাগরিক এবং আদর্শ ও মানব হিতৈষী রাষ্ট্রনায়ক হওয়া। নাগরিকের যেমন কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ন জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য ঠিক তেমনি রাষ্ট্রনায়ককেও

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গল ও নিরাপত্তার জন্য সদা সতর্ক থেকে তার সুব্যবস্থা করার আপ্রান চেষ্টা করতে হবে।

এ প্রসংগে মহান প্রভূর ঘোষনা-

هو الذى جعلكم خلئف فى الارض ٥

''তিনিই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।'' (সূরা ফাতির ঃ ৩৯) অর্থাৎ প্রভূ পরওয়ারদিগারে আলম মানুষকে একটি আমানতের গুরু দায়িত্ব প্রদান করেছেন যা আসমান বা জমিন কিংবা পাহাড়-পর্বত কেউ গ্রহন করতে সম্মত হয়নি। যথা-

''নিশ্চয় আমি আকাশ, জমিন ও পর্বতসমূহের নিকট 'আমনত' উপস্থাপিত করেছিলাম; কিন্তু তারা এটি বহন করতে অস্বীকার করে বসে এবং এতে ভীত হয়ে পড়ে। অথচ মানুষ তা বহন করে নেয়।'' (আল কুরআন)

বস্তুতঃ এ গুরু দায়িত্ব অর্পন করে মহান প্রভূ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীর বুকে প্রেরন করেছেন। অতএব একদিকে যেমন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব। ঠিক তদ্রুপ মহান শ্রষ্টার দেয়া একমাত্র দ্বীনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে একে সঞ্জীবিত রাখাও অবশ্য কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব। একজন মুসলমান যা শিখবে তা সে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে অপর মুসলমানকেও তা শিক্ষা দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ফলে প্রত্যেকেই জ্ঞান, অর্জন করতে পারবে এবং দ্বীনের চর্চা এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতএব যে শিক্ষা দেশ ও জাতির কল্যান বহন করে এবং যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল দ্বীনের খেদমত করা সে শিক্ষাই অর্জন করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিয়ে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতঃ মহানবী সঃ এরশাদ করেছেন-

"যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্য জ্ঞান অন্বেষন করা অবস্থায় মৃত্যুবরন করে, বেহেশতে তার ও নবীগনের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের ব্যবধান থাকবে" (আল হাদীস)

পক্ষান্তরে যে শিক্ষা দেশ ও জাতির কল্যানের পরিপন্থী যা দ্বীনের প্রতিবন্ধক, ইসলামে সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। কেননা এরুপ শিক্ষার দ্বারা যেমন দেশ ও জাতি তথা দ্বীনের কোন কল্যান সাধিত হয় না, ঠিক তেমনি সে ভ্রান্ত জ্ঞানীরও কোন মূল্য ইসলামে নেই। সুতরাং একদিকে যেমন কল্যানকর জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য অপরদিকে তা আমল করাও অপরিহার্য শর্ত। কেননা আমলবিহীন ইলম সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন যা কারোই কোন উপকারে আসতে পারে না।

অতএব ইলম ও আমলে পুরিপূর্ণতা অর্জন, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কল্যাণকর জ্ঞান আহরন এবং মানব কল্যানে তার সুষ্ঠু বিতরন করাও ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ উদ্দেশ্য ঃ-

সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন অন্যতম উদ্দেশ্য। পার্থিব জীবনে সকলেই নিরাপদ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে আগ্রহী। আর ইলম অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের এ দুর্লভ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান ও আখিরাতের চিরশান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। এ জ্ঞানের দ্বারাই মহান আল্লাহ পাকের দেয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার ও সদ্ব্যবহার করে যেমন নিজেকে, দেশকে ও জাতিকে সম্পদশালী করা যায় ঠিক তেমনি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মহান আল্লাহ পাকের দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারই প্রদর্শিত সিরাতাল মুস্তাকীমের আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে চিরন্তন জীবন, আখিরাতের চিরশান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। তবে এরূপ শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান, বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও গবেষণা এক কথায় মানব কল্যানে সম্মত হতে হবে। অন্যথায় ইসলামের নীতি বহির্ভূত যে কোন শিক্ষা তা যতই আকর্ষনীয় হোক না কেন কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ লোভনীয় হোক না কেন মুসলিম সমাজে সে শিক্ষা কখনও গ্রহনযোগ্য হবে না।

পঞ্চম উদ্দেশ্য ঃ-

অর্থ উপার্জন করা শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও একটি অভিমত রয়েছে। পার্থিব জীবনে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা। কারণ অর্থ ব্যতীত ধর্ম কর্ম কোনটাই সুষ্ঠুভাবে পালন সম্ভব নয়।

সারওয়ারে কায়িনাত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- ইবাদতের দশ ভাগের নয় ভাগ বৈধ জীবিকা অর্জনের মধ্যে নিহিত। অতএব এ দিক দিয়ে বিচার করতে হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হালাল জীবিকা অর্জন বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত পাচ প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কোন একক উদ্দেশ্যকে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে না।

তথ্য সংগ্রহ

১। উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা- পৃষ্ঠা নং- ১৪৩- ১৪৯

২। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা- পৃষ্ঠা নং- ৮- ১০

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৩

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ঃ

ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হল ইসলাম শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চেনে ও আল্লাহতায়ালাকে চিনতে পারে। আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআনের আলোকে ঃ[১]

আল কুরআনে শিক্ষার প্রতিশব্দ হিসেবে علم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে علم অর্থ শিক্ষা, জ্ঞান, বিশ্বাস। কোন বিষয়কে তথ্য সহকারে জানা। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদের বহুস্থানে علم বা শিক্ষা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন-

* ''যাদের ইলম রয়েছে এবং আর যাদের ইলম নেই তারা কি সমান? তা কখনো এক হতে পারে না।'' (সূরা আল যুমার - ৯)

* ''যাকে হিকমাত বিজ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যান দান করা হয়েছে।'' (সূরা বাকারা-২৬৯)

* ''যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে (অর্থাৎ তারা জ্ঞানপ্রাপ্ত) তাদেরকে অনেক মর্যাদা দান করা হয়েছে।'' (সূরা আল মুজাদালাহ-১১)

* ''তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নির্দশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।'' (সূরা আল আনআম-৯৭)

* ''বান্দাহদের মধ্যে তারাই আল্লাহকে ভয় করে যারা জ্ঞানী''।

(সূরা আল ফাতির-২৮)

* আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে ''হে প্রভূ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'' (সূরা তোয়াহঃ ১১৪)

* ''নিশ্চয়ই আসমান ও জমীনের সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দন্ডায়মান, শায়িত অবস্থায় আসমান জমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা করে।'' (সূরা আল ইমরান ১৯১-১৯২)

* ''আমি আকাশ মর্ত ও পাতালকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করেছিলাম''।কুরআনের এ বাণী অজানাকে জানার, অজানা রহস্যকে উদঘাটনের অনুপ্রেরনা যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

* ''আল্লাহ জ্ঞানহীনদের সম্বন্ধে বলেছেন, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় এবং তা হতেও নিকৃষ্ট।'' (সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯)

* ''আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য যেমন নিদর্শন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাতে এবং বর্নের বৈচিত্রের মধ্যে''। (৩০ঃ২২)

* ''মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু জন্মে সে সব এবং যা আমাদের জানা ছিল না তার প্রতিটিকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে এবং মানুষকে এসবই ভেবে দেখতে বলা হয়েছে''। (৩১ঃ১০)

* ''মানুষ এবং প্রানী জগতের বংশ বিস্তারের মধ্যেও আল্লাহর যে নিদর্শন রয়েছে তার উপরও মানুষের দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে''। (৪৫ঃ৪)

হাদীসের আলোকে ঃ-[২]

মহানবী সঃ শিক্ষার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার প্রত্যক্ষ বাণীসমূহ মুসলমানদের হৃদয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। জ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী সঃ বলেন ঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

* ''অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।''(ইবনে মাজা)

এ হাদীস হতে জানা যায় যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ এবং তা অন্যান্য ফরজ ইবাদতের মত ফরজ। এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই জ্ঞান শিক্ষা ফরজ করা হয়েছে।

এছাড়া ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ হওয়ার অনুকূলে নিম্নে কতকগুলি হাদীসের উল্লেখ করা হল-

নবী করীম সঃ বলেন-

طلب العلم واجب على كل مسلم

* ''প্রতিটি মুসলমানের উপর জ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব।''

(সাহাবী আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত)

طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم

* ''ইসলামের বিধান ও নীতিমালার জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।''

(সাহাবী আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত)

Dhaka University Institutional Repository

* ''ইলম শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও।'' (সাহাবী আবু সাঈদ ও আব বকর রাঃ থেকে বর্ণিত)

* সাহাবী ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত দায়লামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে তোমরা ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর।''

يا ايها الناس عليكم بالعلم قبل ان يقبض

* হে লোক সকল! রুহ কবয হওয়ার পূর্বে ইলমে দ্বীন অর্জন করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। (সাহাবী আবু উমামা রাঃ থেকে বর্ণিত)

ويل لمن لا يعلم

* ''যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে না তাঁর জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। (সাহাবী হুযায়ফা রাঃ থেকে বর্ণিত এবং কানযুল উম্মান গ্রন্থে উল্লেখিত।''

উপরোক্ত হাদীসগুলি দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা যে ফরজ, তার প্রমান মেলে। আর উক্ত হাদীসগুলির বর্ণনা সূত্র শুদ্ধ।

এছাড়া আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা দ্বারা জ্ঞান অন্বেষনের তাগিদ পাওয়া যায়। যথা- মহানবী সঃ বলেছেন-

1. ''আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির কল্যান করতে চান তখন তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।'' (বুখারী ও মুসলিম)

2. ''জ্ঞান অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি ভ্রমন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথকে সুগম করে দেন।'' (মুসলিম)

3. যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার জন্য পথে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথের যাত্রী থাকে। (তিরমিযী)

4. যে শিক্ষার্থী জ্ঞান অন্বেষনে বের হয় আল্লাহ তার জন্য শান্তির প্রাসাদে উচ্চাসন নির্দিষ্ট করেন। তার প্রতিটি পদক্ষেপ রহমতে পরিপূর্ন তার প্রত্যেকটি পায়ের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

5. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষন করে তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জ্ঞান চর্চা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। জ্ঞান সকল ইবাদতের ভিত্তিমূল। জ্ঞান না থাকলে ঈমান পরিপূর্নতা লাভ করে না। তাই মহানবী (সঃ) এর দৃষ্টিতে নফল ইবাদতের তুলনায় জ্ঞান চর্চা করা অধিক সওয়াবের কাজ।

6. ''রাতে কিছুক্ষন জ্ঞান চর্চা সারারাত নফল ইবাদত থেকে উত্তম।'' (তিরমিযী)

Dhaka University Institutional Repository

7. ''জ্ঞানী আলেমগন নবীদের উত্তরাধিকারী''। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

মহানবী সঃ একবার বলেন, ''যে দিন আমি জ্ঞান চর্চা করিনা সে দিনটা আমার জীবনের অংশ নয়।'' এ হাদীসের আলোকে বলতে হয় যে, শিক্ষা বর্জিত জীবন ব্যর্থ। জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব নির্দেশক আরও কয়েকটি হাদীস নিম্নরুপ-

* এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা এক বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।
* জ্ঞানীর নিদ্রা অজ্ঞের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।
* জ্ঞানীগুনীদের সমাবেশে অবস্থান করা এক হাজার রাকাত পড়া। এক হাজার রোগীর পরিচর্যা করা এবং এক হাজার জানাযায় অংশ গ্রহনের চেয়েও উত্তম। (বুখারী)
* জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।
* জ্ঞান মানুষকে সুখের পথে পরিচালিত করে, দুঃখে ধৈর্যশীল করে।
* বন্ধু মহলে জ্ঞান অলংকার, শত্রুর বিরুদ্ধে তা বর্ম বিশেষ।
* যে জ্ঞানীকে সম্মান করে সে আমাকেই সম্মান করে।

* জ্ঞান অর্জন কর কেননা আল্লাহর পথে জ্ঞান তার অধিকারীকে ভালমন্দের পার্থক্য নিরুপন করতে সাহায্য করে, বেহেস্তের পথ আলোকিত করে।

* জ্ঞান অর্জন কর কেননা আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জন করা পূন্যের কাজ। যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে।

* যে জ্ঞান অন্বেষন করে, সে আল্লাহর ইবাদত করে। যে জ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে সে জ্ঞান দান করে। যে জ্ঞান শিক্ষা দেয় সে আল্লাহর ইবাদত করে।

এভাবে পবিত্র কুরআন মজিদে ও আল হাদীসে শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত তেজদীপ্ত ভাষায় বিবৃত হয়েছে। মহানবী (সঃ) তার জীবন সংগ্রামেও শিক্ষার গুরুত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বদরের যুদ্ধে বন্দী পরাজিত শত্রুদের শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি দান শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তথ্য সংগ্রহ

১। কুরআনের আলোকে- আল কুরআন দ্রষ্টব্য।

২। হাদীসের আলোকে-ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা পৃষ্ঠা নং-৩০,৩১ এবং হাদীস শরীফ কিতাবুল ইলম অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৪

নারী শিক্ষায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ঃ

নারী শিক্ষাকে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদীস দ্বারা ফরজ করা এবং পবিত্র কুরআনে কারীমে এর পক্ষে অনেক রকম যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আলেম সমাজ ''নারী শিক্ষার'' পক্ষে এবং বিপক্ষে ২টা শ্রেনীতে বিভক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একদল নারী শিক্ষার বিপক্ষে কঠোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং অন্যদল নারী শিক্ষার পক্ষে উদার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে নারী শিক্ষা প্রসংগে উভয়দলের মতামত আলোচনা করা হল।

''কঠোর ব্যাখ্যা''[১]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নারী শিক্ষার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও একদল লোক নারী শিক্ষাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। কারন তারা মনে করে নারীকে শিক্ষিত করলে তারা চেতনায় পরিনত হবে। তাদের এ ধরনের ধারনা পোষন করা একেবারেই অযৌক্তিক। তারা আসলে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তারা কট্টরপন্থী ও সত্যচ্যুত। তাদের ধারনা যদি সত্যই হবে তবে রাসূল করীম সঃ এর অন্যতম স্ত্রী হযরত আয়েশা রাঃ যিনি একধারে তাফসীরবিদ, হাদীসবেত্তা, ফিকহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাহলে কি তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করে অন্যায় কাজ করেছিলেন? মূলত এসব কট্টরপন্থী আলেমরা নারীদেরকে শিক্ষার মত মৌলিক ও মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। তারা নারীদেরকে গৃহের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ করে রাখাকেই শ্রেয় মনে করে থাকে।

এমন কি অনেকেই আবার ভেবে থাকেন যে, সৎ নারীদের বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি এবং সেখানে থেকে কবরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সময় বাড়ির বাইরে বের হওয়া তাদের জন্য শোভা পায় না। অথচ পবিত্র কুরআনে কেবলমাত্র ব্যাভিচারী নারীর ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ আসার পূর্বে পাপ কাজে রত অবস্থায় দেখেছে এমন চারজন সাক্ষ্য দাতার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একজন অসৎ চরিত্র নারীকেই শুধুমাত্র গৃহের চৌহদ্দিতে আটকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন-

''তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী গ্রহন কর। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সেই ব্যাভিচারিনীদেরকে ঘরের বন্দী করে রাখ। যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়। অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন।'' (সূরা নিসা-১৫)

উপরোক্ত কট্টর আলেমগনের নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার দৃষ্টিভংগি থেকে বুঝা যায়, তারা নারী শিক্ষার ব্যাপারে কতটা কঠোর। তাদের এটা অন্ধ গোড়ামী ছাড়া আর কিছুই না। কারন যেখানে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষন করে হাদীসে নবী করীম সঃ বলেছেন- اطلبوا العلم ولوكان بالصين

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসে কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে চীন দেশে যেতে বলা হয়নি। কিংবা শুধুমাত্র নারীদেরকেও নির্দেশ করে দেয়া হয়নি। তাই উক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় নারীরাও উক্ত হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অথচ কট্টর আলেম সমাজ তাদের মূর্খ গোড়ামীর দ্বারা নারীদের লেখাপড়ার পথকে বন্ধ করে দিতে চায়। তাদের মূর্খতার জবাবে বলা যায়। তারা লেখাপড়া করবে ঠিকই তবে সীমা লংঘন করে নয়। যথাযথভাবে পর্দার মধ্যে থেকে লেখাপড়া করতে হবে। যেভাবে ইসলামের অনুমোদন রয়েছে।

তাদের জবাবে আরও বলা যায় যে, যেহেতু বিদ্যা শিক্ষা করা নারী পুরুষ সবার জন্য ফরজ। তাই দেখা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মাহাতুল মুমিনীন, মহিলা সাহাবী এবং তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ মহিলাগণ হাদীস ও ফিকহের মাসয়ালা মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমন কি আরবী সাহিত্য, কবিতা চর্চা ও ভাষা শাস্ত্রেও তারা পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অথচ একদল আলেমের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র দ্বীনি ইলম শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া ঠিক নয়। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এগুলি শিক্ষা করলে পার্থিব বিষয়ের শিক্ষায় নারীদের চরিত্র বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

এছাড়া তাদের দৃষ্টিতে মহিলাদের পক্ষে পত্র পত্রিকা ও গল্প উপন্যাস এবং নাটকের বইপত্র পড়াও বিষতুল্য। তাদের এ দৃষ্টিভংগির উত্তরে বলা যায় ইসলামের দৃষ্টিতে পত্র, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকের বই পড়া নাজায়েজ নয়। তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে-এগুলো পড়ে ইসলামের ভিত্তিতে মুল্যায়ন করতে হবে।

হাদীস বর্ণনা কারী ইমামদের অনেকেই নির্বিঘ্নে মহিলা সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কারীমা বিনতে আহমদ আল মারুযিয়া নাম্নী মহিলা থেকে ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এমন কি তাদের দৃষ্টিতে নামাজ পড়ার জন্যে নারীদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে বলা হয়েছে। একথা জেনে রাখা দরকার যে, মহিলারা হযরত রসুল সঃ এর যুগে ফজর ও এশার নামায মসজিদে জামাতের সাথে পড়তেন। এ প্রসংগে রসুল সঃ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - (مسلم)

অর্থাৎ "আল্লাহর দাসীদের মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করেন না।" (মুসলিম)

অবাক হতে হয় আজকের এই সভ্য যুগেও মুসলিম মহিলারা মসজিদে যাওয়ার এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। মনে করি তাদেরকে এভাবে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বাইরে আসতে না দেয়ার আসল অর্থ হচ্ছে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে ঘরে থেকে কি মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়া যায় না। তার উত্তরে বলা যায়। হ্যাঁ যায় তবে শিক্ষার পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায় না। ঘরে বসে যদি মেয়েদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়া করানো যেত তাহলে দুনিয়াতে বালিকা স্কুল, মহিলা কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হত না।

ইহুদী নারীরা তাদের উপাসনালয়ে, খৃষ্টান নারীরা তাদের গীর্জায় বৌদ্ধ ও হিন্দু মহিলারা তাদের মন্দিরে নিয়মিত পূজা ও আরাধনা করে চলছে। অথচ মুসলিম মহিলারাই শুধুমাত্র এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমন কি পিতা বা স্বামীর সাথে মিলে দৈনন্দিন যেসব কর্মকান্ডে তারা অংশ নিতে পারে তা থেকেও তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এর মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবীও তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে আওয়ামের (রাঃ) সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। এর চেয়েও স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন -

''হে পিতা তাকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করুন। কেননা কর্মঠ ও সৎ লোককেই কাজে নিয়োগ করা ভাল। কি আশ্চর্য! সে মেয়ের এ কথা ও পরামর্শকেই পুরুষদেরকে কাজে নিয়োগ করার ইখতিয়ার হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে''।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামে নারীর মতামতের কত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার থাকবে না এটা কি কখনও হতে পারে?

নারীদের কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র, গৃহাভ্যন্তরে সংকুচিত করে রাখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াত ও হাদীস গুলো বাদ দিয়ে প্রায়শই ''মুতাশাবাহাত'' বা অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহকে দলীল হিসাবে গ্রহন করা হয়। বিশেষভাবে নবী (সঃ) এর স্ত্রীদের উপর সূরা আল আহযাবে অবতীর্ণ আয়াত সমূহকে প্রমান হিসাবে পেশ করা হয়।

আল্লাহ বলেন -

1. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারন স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না। যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হতে পারে বরং সোজাসুজি ও স্পষ্ট ভাবে কথা বলো। আর নিজের নিজের ঘরে অবস্থান কর। (সূরা আহযাব- ৩২-৩৩)

2. আর যদি তাদের কাছে কোন জিনিস চাও, তবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও। (সূরা আহযাব- ৫৩)

এছাড়া উল্লেখ্য যে, নারী শিক্ষার বিরুদ্ধ বাদীরা নারী শিক্ষার বিপক্ষে হাদীসের নানা রকম উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আশ শায়খ মুহাম্মাদ আল গাজ্জালী সেটা একটা ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একদা তার সাথে আলোচনার একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। তা হলো এই যে, ভদ্রলোক তাকে বলেন, বক্তারা যেমন শ্রোতাদের ভাবাবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে আবেগ সঞ্চারমূলক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আপনি তাদের মত হাদীস কি তাহলে হযরত রসূল সঃ এর কন্যা ফাতেমা রাঃ থেকে বর্ণিত এ হাদীস বিশ্বাস করেন না, যাতে বলা হয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

''কোন ক্রমেই নারীরা পুরুষদের প্রতি তাকাতে পারবে না এবং আর কোন পুরুষও নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবে না।'' আর রসূল (সঃ) এ হাদীসটিকে এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন পিতা এবং সন্তান যেহেতু পরস্পর পরস্পরের বংশোদ্ভুত, তাই তারা একে অপরকে দেখতে পারবে। এ হাদীসটি থেকে কি শরীয়তের এ বিধানই উদঘাটিত হয় না যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে রাখা ফরজ। জবাবে লোকটিকে ইমাম গাজ্জালী রহঃ বলেন তুমি নারী সংক্রান্ত এমন একটি প্রত্যাখ্যাত মনগড়া হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে যা স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয় নি। বরং তোমার উদ্ধৃত এ হাদীস কুরআন ও হাদীসের বহুল প্রচারিত বুনিয়াদী শিক্ষা এবং রাসূল সঃ ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের পরিপন্থী। নারী শিক্ষাকে হারাম করার জন্য হাদীস জালকারগণ সুপরিকল্পিত ভাবে এ হাদীসটি রচনা করেছেন। আর কুচক্রী মহল মুসলিম নারীদের মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়াও হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে এবং ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে তাদেরকে আলাদা রেখে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা নারী শিক্ষার প্রতি এ রকম ধারনা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকই নয় অন্ধত্ব, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সম্প্রসারনেরও একান্ত সহায়ক। কেননা তৃতীয় বিশ্বের মুসলমানদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অধঃপতনের আরেকটি প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরন। এভাবে আলেম সমাজ নারী শিক্ষার বিপক্ষে কঠোর যুক্তি প্রদান করেছেন।

উদার ব্যাখ্যা ঃ[২]

নারী শিক্ষার পক্ষে যে সব আলেমগণ উদার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাদের মতামত নিম্নে প্রদান করা হল।

হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এর মতে,-

তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারে মহিলাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজের লোকদের নানা মনোভাব ও দৃষ্টিভংগি লক্ষ্য করে তাদেরকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ-

প্রথম শ্রেনী ঃ প্রথম শ্রেনীভুক্ত হচ্ছে তারা- যারা নারী শিক্ষার বিরোধীও নয়, আবার এর পক্ষেও নয়। অর্থাৎ নারী শিক্ষার নিরপেক্ষ।

দ্বিতীয় শ্রেনী ঃ যারা নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী।

তৃতীয় শ্রেনী ঃ তৃতীয় শ্রেনীভুক্ত হচ্ছে সে সব লোক যারা নারী শিক্ষার পক্ষপাতি। এই তিন শ্রেনীর লোকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। নারী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নে এই তিন শ্রেনীর মতামত ও উহার জবাব দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রথম শ্রেনীর লোকদের ভ্রান্তি ঃ

প্রথম শ্রেনীর লোকদের সবচেয়ে বড় ভুল হল এই যে, তারা নারীদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আদৌ কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না। পুরুষদের দ্বারা যেমন শিক্ষা দেয়াকে প্রয়োজন মনে করে না, তেমনি নারীদের দ্বারাও তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাকে অপরিহার্য ভাবে না। তাদের মনোভাবের পিছনে যুক্তি হলো, নারীরা কি চাকুরী করবে যার জন্য তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন? সুতরাং তারা যখন চাকুরী করবে না তখন তাদের শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

তাদের এরকম ভ্রান্ত মনোভাবের জবাবে খানভী রঃ বলেন, তারা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি তা-ই বোঝেনি এবং শিক্ষার ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তাভাবনা করে না। অথচ এসব হাদীস দ্বারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা নারী পুরুষ উভয় শ্রেনীর প্রতি ফরজ প্রমানিত হয়। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ হওয়ার অনুকূলে নিম্নে কতগুলি হাদীসের উল্লেখ করা হল-

নবী করীম সঃ বলেছেন-

- طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (ইবনে মাজা)
- طلب العلم واجب على كل مسلم (সাহাবী আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত)
- দোলনা হতে কবর পর্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা কর।
- সাহাবী আবু সাঈদ ও আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত

تعلموا العلم وعلموه الناس

- ''দ্বীনি ইলম, শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও।''
- বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর সঃ বলেছেন ''আল্লাহ যার কল্যান চান তাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন।''
- হুজুর সঃ বলেন, ইলম হাসিলের উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি যে পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের পথ অতিক্রমের মধ্যে গনা করেন।
- আলেম যদি তার ইলমের দ্বারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে, তবে সেই আলেমকে এমন ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব দান করা হয় যে, তাকে সকলেই ভয় ও ভক্তি করে।

উপরোক্ত হাদীসগুলি থেকে বুঝা যাচ্ছে ইলম অর্জন করা কত জরুরী এবং ইহা অর্জনের মর্যাদা অনেক বেশী।

তিনি ইলম অর্জন প্রসংগে আরও বলেন যে, একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, ইসলামী শিক্ষা করার উদ্দেশ্য চাকুরী করা নয়। কেননা যে ইলম শিক্ষা করা ফরজে আইন সে ইলম জীবিকা অর্জনের ইলম

Dhaka University Institutional Repository

নয়; বরং যে ইলম শিক্ষা করা ফরজে আইন তা হচ্ছে ইলমে দ্বীন। ইলমে দ্বীন শিক্ষা দ্বারাই মানুষের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আমল, পারস্পরিক লেনদেন, আদান ও চরিত্র সুন্দর হয়। এ প্রকার দ্বীনে ইলমের যে পার্থিব ফল জগতে প্রকাশ পায় তা কুরআন মজীদের ভাষায় —

اولئك على هدى من ربهم ٥

অর্থাৎ "এ জগতে তারা তাদের প্রতিপালনের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত হিদায়েতের উপর রয়েছে।" আর এ ইলম যারা অর্জন করবে তাদের পরকালীন জীবনে সুফল প্রতিভাত হবে, তা কুরআনের ভাষায় এ সুসংবাদটি-

اولئك هم المفلحون ٥

অর্থাৎ "এরা হচ্ছে সেই লোক যারা হবে সফলকাম।" সুতরাং এ প্রকার ইলম শিক্ষা করা যে ফরজে আইন তা সুস্পষ্ট।

২। দ্বিতীয় শ্রেনীর লোকদের সম্পর্কে অভিমত ঃ

দ্বিতীয় শ্রেনীর লোকেরা হচ্ছে নারী শিক্ষার একান্ত বিরোধী, তারা নারীদিগকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে।

নারী শিক্ষার বিপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেনীর লোকেদের যুক্তি হচ্ছে। —

প্রথমত ঃ

অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাদের নির্ভীক, নির্লজ্জ প্রচারক ও সতীত্বহীন রূপে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে যদি লেখাপড়া জানে তাহলে তাদের চোখ খুলে যায়। এরপর বখাটে ছেলেদের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে চরিত্র ধ্বংস করে। পরিনামে কি হবে তা তারা জানতে পারে না। শেষে এমন অবস্থায় তারা উপনীত হয় যার পরিনাম ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন এসব ঘটনার মূল কারন হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা।

দ্বিতীয়ত ঃ

মেয়েদেরকে শিক্ষিত করলে তারা আবার রচনা ও প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে। এসব লেখার সুবাদে দুষ্টমনের লেখক ও কথাশিল্পীরা দুষ্টমীর জাল বিস্তার করে। বিশেষ করে লেখিকার লেখাটা কবিতার ছন্দে হলে আরও অধিক বিপজ্জনক। এসব দুষ্টামী ও নষ্টামী লেখাপড়া শিক্ষার কারনেই হয়ে থাকে। এসব গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে কোন সময় স্বামী বা পরিবারের অন্য কেউ জানতে পারলেও লেখাপড়া জানা চতুর ও বাকপটু মহিলারা এমন সব যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করে, যার উপর কোন কথাই বলা চলে না। এরপর তাকে বেশী কিছু বললে আত্মহত্যা ও কুয়ায় ডুবে মরার হুমকিও দেয়া হয় অনেক সময়।

Dhaka University Institutional Repository

এসব কারনে তারা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এগুলি হচ্ছে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ।

বিরুদ্ধবাদীদের এসব অভিযোগকে মাওঃ ধানভী (রহঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন মনে করেন না। তবে তিনি একথা অবশ্যই মনে করেন যে, এসব লোক নারী শিক্ষার ব্যাপারে সংকীর্নমনার পরিচয় দিয়েছে। এসব ঘটনাবলীর মূলতত্ত্ব উদঘাটনে তারা আদৌ কোন চিন্তা ভাবনা করেনি।

বিরুদ্ধবাদীরা যে সব অভিযোগ পেশ করেছেন তার জবাবে তিনি বলেন- এসব ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয় বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ন ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় হয়ত এমন সব কিতাব ও বইপত্র পড়ানো হয় না-যা দ্বারা তা হালাল ও হারামের বিধান অবগত হতে পারে, পূন্য লাভ ও শাস্তির যোগ্য হওয়া এবং চরিত্র গঠন সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ ছাড়া আল্লাহর ভয়, তার পরিচয়,আযমত ও তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয় এমন বই তাদেরকে পড়ান হয় না শুধু অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। শুধু অক্ষর জ্ঞানকেই শিক্ষা বলা যায় না। যার কারনে তাদের আমল আখলাকের সংশোধন হয় না।

তিনি আরও বলেন, বিরুদ্ধবাদীরা যেসমস্ত যুক্তি দেখিয়েছে, এ সমস্ত খারাপ আচরণ বন্ধ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে কঠোরতা অবলম্বন করা এবং পুরুষদেরকে এ ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে অবহিত করা। যেহেতু নারী পুরুষ উভয়ের দ্বারাই এই ফিতনার সৃষ্টি। তাই শুধু মহিলাদেরকেই অপরাধী করা ঠিক নয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে নারীদিগকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হচ্ছে এবং পুরুষদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে সব ধরনের স্বাধীনতা দিয়ে গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা লাভের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

শিক্ষার ব্যাপারে এ পার্থক্য করার কারণ চিন্তাভাবনা করার পরে এটাই বুঝতে পারা যায় যে, নারীদের থেকে যেসব খারাপ কাজ প্রকাশ পায় সেগুলোকে সমাজে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ ভাবা হয়। পক্ষান্তরে ঐ একই ধরনের কাজগুলি যদি পুরুষদের দ্বারা সংঘটিত হয় তাহলে সেগুলি সমাজে অপমান ও লাঞ্চনার কারণ ভাবা হয় না। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। নারীদের বেলায় গুনাহ যদি নিন্দনীয় ও ভৎর্সনার যোগ্য বিষয় হয় তাহলে পুরুষদের বেলায়ও অনুরুপ হবে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের আয়াত হচ্ছে-

"কেউ পাপাচারে লিপ্ত হলে সে তার কর্মের অনুরুপই সাজা পাবে। আর নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে যেই সৎ কর্ম করবে। সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদেরকে অফুরন্ত রিযিক দানে ভূষিত করা হবে।" (সূরা মুমিন- ৪০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে যখন উভয়ই সমমানের এখন সামাজিক দৃষ্টিতে প্রভেদের বাস্তবতা কতটুকু? আর এ প্রভেদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীদের জন্য তা গুরুতর অপরাধ রূপে গণ্য করা এবং পুরুষদের জন্য অনুরুপ গন্য না করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে শরীয়তের উপর সামাজিক দৃষ্টিভংগিকে প্রাধান্য দেয়া। এরুপ দৃষ্টিভংগি নারাত্মক জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। যার উৎস হচ্ছে গৌরব ও

Dhaka University Institutional Repository

অহংকার বোধ। মাওঃ থানভী (রহঃ) বলেন এটা শুধু তারই দাবী নয় বরং অভিযোগকারীরাও এটা স্বীকার করেন।

এমনকি এসব লোকদের মুখ থেকে অধিকাংশ সময় এমন কথা শোনা যায়, পুরুষরা হচ্ছে পেয়ালার ন্যায়। পেয়ালা ধৌত করলে যেমন পরিষ্কার হয়ে যায় অনুরুপ পুরুষরা অন্যায় করলে তা ধর্তব্য নয়। আর নারী হচ্ছে মনি মুক্তার পানির ন্যায় যা একবার পতিত হলে আর কখনও উঠে না। যেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা। তারা মূলতঃ এরুপ নানা রকম অভিযোগ তুলে নারী শিক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চায়।

তৃতীয় শ্রেনীর লোকদের ধারনার জওয়াব ঃ

তৃতীয় শ্রেনীর লোকেরা নারী শিক্ষার পক্ষপাতি ও সাহায্য কারী। কিন্তু তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা মহিলাদের শিক্ষার ধরন, বিষয় নিরুপন ও শিক্ষা দানের পদ্ধতি নির্ধারনের মধ্যে ভুল করেন। যার কারণে নারী শিক্ষা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। তাদের চিন্তাধারা সংশোধনের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেনীতে আলোচনা করা হয়েছে।

মাওঃ থানভী (রঃ) নারী শিক্ষার ব্যাপারে আরও বলেছেন- যে শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা বলা হয়, তা নারীদের জন্য কখনও শোভনীয় নয়। তবে পার্থিব বিষয়গুলোর মধ্যে প্রয়োজন পরিমান গ্রহন করা বৈধ যেমন - হিসাব নিকাশ ও হস্তশিল্পের কাজ।

হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রঃ এর দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা ঃ [৩]

তিনি বলেছেন, মহিলাদের ইসলামী আহ্কাম ও অনুশাসন শিক্ষা দান একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, নারীদের মনে হয়তো এ ধারনা জন্মেছে যে, তাদের কাজ হলো শুধু ঘরের কার্যাবলী সম্পাদন করা। নামাজ পড়া ও শিশুদের পরিচর্যা করা। ব্যস এতেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। তাদের মতে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা তাদের কাজ নয়।

এর উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা হলো এক ধরনের বাহানা মাত্র। মূল কথা হচ্ছে, পুরষদের জন্য জ্ঞান চর্চার যে সকল স্তর রাখা হয়েছে, নারীদের জন্যও সে সব স্তর রয়েছে। মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় বড় আলিমা পন্ডিত ও বিজ্ঞানী হতে পারেন। মাত্র গুটি কতেক পদ এমন আছে, যে গুলোতে নারীদের অংশ গ্রহনের অবকাশ ইসলামে নেই। যেমন নারীদেরকে নবুওয়াত বা ইমামত দেয়া হয়নি। যদিও ইমাম লাউল জাহেরীর মতে, ''মহিলাদের মধ্যেও নবী হয়ে ছিলেন। তার মতে, হযরত ঈসা আঃ এর মাতা মরিয়ম আঃ এবং মুসা আঃ এর মাতা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রমুখ নবী ছিলেন।''[৩] যাহোক নারীদের শরীয়তের ধারক বাহক হওয়াটা মুশকিল। কারণ তখন তার সামনে পুরুষদের আসতে হবে। এতে পর্দা বজায় থাকবে না। যা প্রত্যেক শরীয়তেই ফরয ছিল। তাই এটা আল্লাহর পাকের পক্ষ থেকে কার্পণ্য বা পক্ষপাতিত্ব নয়। বরং সত্যিকার অর্থে এটা তাদের মর্যাদার অনুকূলই বটে। এমনিভাবে মহিলাদেরকে বিচারের দায়িত্ব বা পদ প্রদান করা হয়নি কারণ এর দ্বারাও পর্দা প্রথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। মহিলাদের মধ্যে বড় বড় কবি মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুফতী ও ফকীহা ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর জননী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ''ওহীর অর্ধেকটা জ্ঞান আছে আয়েশা রাঃ এর নিকট এবং বাকী অর্ধেকটা সাহাবার নিকট।''[৪] (আল হাদীস)

বড় বড় সাহাবীগণ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাঃ এর নিকট মাস'য়ালা জিজ্ঞাসা করতে আসতেন উম্মাতের উপর হযরত আয়েশা রাঃ এর এটা এক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি রাসূল সঃ এর নিকট প্রশ্ন করে জ্ঞানের বহুদ্বার খুলে দিয়েছেন। সেটা একটা হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। হাদীস শরীফে আছে যে, কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে তারা স্বীয় পিতা মাতার জন্য সুপারিশ করবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাঃ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি কারও দুটি শিশু মারা যায় তবে! রাসূল সঃ বললেন- তার জন্য একই হুকুম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যদি একজন মারা যায়? উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন তারও একই হুকুম। শিশুরা আল্লাহর সংগে জেদ ধরবে, ঝগড়া করবে, পিতা মাতার জন্য জাহান্নামের পথে এই বলে বাধা হবে যে, আমাদের সংগে আমাদের পিতা মাতাকেও বেহেশতে যেতে দিতে হবে। ফেরেশতাগণ তখন বললেন তারা তো গোনাহ গার, তাদেরকে কি করে বেহেশতে যেতে দেয়া হবে? শিশুরা তখন জেদ করেই বলবে আমরাও তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দিব না। অবশেষে ফেরেশতাগণ ব্যাপারটি পেশ করবে খোদ আল্লাহর দরবারে। শিশুরা আল্লাহকে বলবে যে, যদি তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাতেই হয় তবে আমাদেরকেও তাদের সাথে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন, কিন্তু শিশুরা যেহেতু নিষ্পাপ বিধায় আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জাহান্নামে দেবেন না। অগত্যা তিনি বলবেন, ''হে আল্লাহর সাথে ঝগড়া কারী শিশুরা যাও, তোমাদের পিতা মাতাকেও বেহেশতে নিয়ে যাও।''

এটা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একমাত্র ইহসান যে, তিনি প্রশ্ন করে করে উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য শরীয়তকে সহজ করে দিয়েছেন। এমন কি শিশু যদি অসম্পূর্ণও হয় সেও তার মাতা পিতার জন্য সুপারিশ করবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রাঃ) ছিলেন একজন নারী অথচ দ্বীনি ইলমের অর্ধাংশই তার চর্চার ইহসান। সে জন্য তার মর্যাদাও ছিল বেশী। হযরত আয়েশা রাঃ এর হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে বুঝা যাচ্ছে নারীদের শিক্ষা দেয়া কত প্রয়োজন। অন্য একটি ঘটনা থেকে নারী জাতির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যা জ্ঞান থাকার কারণে হয়েছিল।

হযরত জাবির রাঃ এর এক ছোট ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় কি একটা জরুরী প্রয়োজনে হযরত জাবির রাঃ এর সফর করতে হলো। তাই তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি সফরে যাচ্ছি। তুমি ছেলের প্রতি বিশেষ যত্ন নিও। এ বলে সফরে চলে গেলেন তিনি। কিছু দিনপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে এলেন ছেলেটি তখন মারা গেছে। মা ছেলের লাশটি অন্ধকার কামরায় নিয়ে ঢেকে রাখলেন এবং হাসি মুখে স্বামীকে স্বাগত জানালেন। স্বামী জিজ্ঞেস করলেন ছেলে কেমন আছে? স্ত্রী উত্তর দিলেন, আল হামদুলিল্লাহ ভালই আছে। অতঃপর স্বামীর জন্য খাবার পেশ করলেন। হযরত জাবির রাঃ খানা খাচ্ছিলেন এমন সময় তার স্ত্রী স্বামীকে বললেন, আচ্ছা বলুন তো! কেউ যদি কারও কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বস্তু আমানত রাখে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে তার উক্ত আমানত ফিরিয়ে নিতে চায়। তবে তা ফেরৎ দেয়া উচিৎ কিনা? উত্তরে হযরত জাবির রাঃ বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমানত ফিরিয়ে দিলে দুঃখিত হতে হয় নাকি? বললেন না দুঃখিত হবার কি আছে? বরং এখানে তো আল্লাহর শুকরিয়া করাই দরকার। অতঃপর স্ত্রী বললেন, আমাদের পুত্র আল্লাহর আমানত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এখন আল্লাহর দূত এসে তাকে নিয়ে গেছে। বলুন, আমাদের এবার খুশী হওয়া উচিৎ, না শোকে মুহ্যমান হবো আমরা? হযরত জাবির রাঃ স্ত্রীর হাতে চুম্বন দিয়ে বললেন, প্রিয়তমা! আমার দুঃখ তুমি দুর করে দিয়েছো। এ ঘটনাটি উল্লেখের উদ্দেশ্যে এই যে, ইলম ও আমল, বুদ্ধি ও জ্ঞান না থাকলে স্বামীর মনেও আনন্দ দিতে পারা যায় না। এই বুদ্ধিমতী মহিলা স্বামীর মন জয় করে তার দুঃখ ঘুচিয়ে মনে আনন্দ দিয়েছেন। এটা তার ইলম ও সূক্ষ্ম জ্ঞান বুদ্ধির পরিচায়ক।

রাসূল সঃ এর সাথে হযরত খদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর বিবাহ হয়েছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির বহু আগে। হেরা পর্বতের গুহায় তার প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হলে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদীজা রাঃকে উদ্দেশ্য করে বললেন زملوني زملوني ''আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দও।''

হযরত খাদিজা রাঃ আরজ করলেন, আপনি অসহায় মানুষের সাহায্য করেন। প্রতিবেশীর এবং যে কোন ভাল কাজে এগিয়ে আসেন। আল্লাহ পাক আপনাকে কোন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবেন না। অতএব আপনি ভীত হবেন না শান্ত হোন। পরে তিনি রাসূল সঃকে নিয়ে ওয়ারকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। বিস্তারিত বিবরন বলার পর ওয়ারকা বললেন, এতো সেই ফিরিশতাই যে, ইতিপূর্বে হযরত মুসা আঃ এর নিকট আগমন করতো। হায়! আপনার জাতি আপনাকে যখন দেশান্তর করবে আমি যদি তখন যুবক হতাম! যদি আমি তখন জীবিত থাকি, তবে মনে প্রাণে আপনার সাহায্য করবো।(বুখারী, বাবুল ওহী)

তাহলে দেখা যায়, একজন নারী রাসূল সঃ এর সাথে পরম ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায় কিভাবে তাকে সান্তনা দান করেছেন। তারা তো ছিলেন প্রথম শ্রেনীর মহিলা, পরবর্তী যুগের মহিলাদের মধ্যেও বড় বড় আলিমা পরহেযগার হয়েছেন। যেমন হযরত ইমাম আবুজাফরের কন্যা হাদীস লিখতেন।

মহিলারা যদি জ্ঞান গরিমার উচ্চ শিখরে পৌঁছুতে চান। তবে তা অসাধ্য কিছু নয়। মহিলারা ধর্মীয় কাজে অগ্রসর হলে সে পথে তারা অতি উচু স্থান অধিকার করতে পারে। আর পার্থিব ব্যাপারে অগ্রসর হলে সেখানেও তারা উচ্চ মর্যাদার সমাসীন হতে পারে। তাদেরকেও আল্লাহপাক কম প্রতিভার অধিকারী করেন নাই। যার প্রমান হিসাবে বলা যায় অনেক মহিলা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রাচীনকালে রানী বিলকিস ছিল বিরাট জাতির সম্রাজ্ঞী। এছাড়া আরও অনেক মহিলাই আছেন যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও মহিলারা ইচ্ছা করলে রুহানিয়াতের চরম শিখরে পৌঁছুতে পারেন। উল্লেখ্য যে নারী জগতের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, ইচ্ছা করলে মহিলারা ইলম ও আমলের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারেন। কিন্তু এজন্য তো সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে কারী সাহেব নারী শিক্ষার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন।

<u>মুফতী মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহর দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা ঃ</u> [৪]

১৯২১ সালে হুকুমতে আফগানিস্থানের তথা মন্ত্রনালয় থেকে নারীদের ইসলামী শিক্ষা প্রসংগ এবং আনুষঙ্গিক কতগুলো প্রশ্ন জনাব মুফতী সাহেব রহঃ এর নিকট পাঠানো হয়। তিনি তার উত্তরে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের ভিন্ন পরিবেশে একত্রিত হয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপক্ষে একটি দীর্ঘ ফাতওয়া লিখেন। ফাতওয়াটি উর্দূভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করে নিম্নে সংযুক্ত করা হল-

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব, শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরামের অবগতির জন্যে স্মরন করিয়ে দিয়ে বর্ণিত মাসয়ালাটির বিশ্লেষণ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উত্তর প্রদান করা যুক্তি সংগত বলে মনে করেছেন-

1. স্থান কাল ও পরিবেশ অনুপাতে মেয়েরা কত বছরে বালেগা হয় এবং কখন তারা আকাংক্ষিতা ও আকর্ষনীয়া রূপে চিহ্নিতা হয়? তাদের সতর কি পরিমান?

2. মাতা পিতার উপর মেয়েদের বালেগা হবার পূর্বে ও পরের হুকুম কি কি? অর্থাৎ কত বছর বয়সে মেয়েদেরকে খোদ মোখতার (আত্মসচেতন) বলে গন্য করা হবে।

3. সতরে আওরতের (পর্দার পরিসীমা) ব্যাখ্যা কি? অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম প্রয়োগের আগে ও পরে পর পুরুষের ও আপন পুরুষের থেকে সতর কি পরিমান এবং এতে পার্থক্য কি? এমনিভাবে ইসলামী শরীয়তে ও ইসলামী সমাজে পর্দা ব্যবস্থার সীমা কি?

4. যে সকল ফরজ মুস্তাহাব কার্যাদি কুরআন হাদীস থেকে প্রমানিত তা কি কি? এগুলো অর্জন করার জন্য ইসলামী শরীয়ত কি কি স্তর নির্ধারন করেছে।

5. বিশিষ্ট বা প্রধান চার ইমামের মতানুযায়ী মহিলাদের কোন স্থানে বা কি অবস্থায় সম্মিলিত হওয়া নিষেধ।

6. বর্তমান আধুনিকতার যুগে মহিলাদের নাগরিক ও শরয়ী হুকুম কি কি হওয়া উচিৎ এবং বর্তমান যমানায় কোন ধরনের শিক্ষা মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয়।

মুফতী মুহাম্মদ কেফায়েতউল্লাহ রঃ উপরোক্ত প্রশ্নগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে নারী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন।

দুনিয়ার অনুসলিম বহুজাতি বা সম্প্রদায় ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে অনেক তথ্য ও বিষয় সংগ্রহ করে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নত, তরান্বিত ও সমৃদ্ধ করেছে এবং ইসলাম এমনই এক সংস্কৃতি যা কালের আবর্তে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না এবং যা স্থায়ী, পরিপূর্ন ও অতুলনীয়। মানব সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শ্রেনীর জন্যই মহান আল্লাহতায়ালা বিশ্বের স্থান ও মূল্য নির্ধারন করে দিয়েছেন যার মধ্যে কোন কল্পিত বা কারও কোন স্বতন্ত্র চিন্তা কাজ করবে না। মহান আল্লাহপাক পুরুষ-মহিলা উভয়কে তাদের ক্ষেত্র বিশেষে মর্যাদাবান করেছেন। তাই পুরুষ মহিলা উভয়ের চলাফেরা ও আচার পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শরীয়তের পক্ষ থেকে সুচারুরূপে সীমা নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। এ সীমা কিছুতেই অতিক্রম করা উচিৎ হবে না। এটি যুক্তিভিত্তিক, অনস্বীকার্য ও এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মাওলানা সাহেব মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারটি সম্পর্কে বলেছেন, এর দুইটি দিক রয়েছে।-

Dhaka University Institutional Repository

1. মহিলাদের ইসলামী শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন কিনা?

2. তাদের শিক্ষা পদ্ধতি কি রুপ হওয়া উচিৎ?

প্রথম বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত পোষন করার অবকাশ নেই। কেননা, ইলমে দ্বীন, অর্জন করা ইসলামী শরীয়তের ফরজসমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ। ইলম শিক্ষার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে শুধু পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কেননা দ্বীনের ইলম শিক্ষা করা মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্য হতে একটি। তাই কোন মানুষ সে পুরুষ হোক, কি মহিলা-দ্বীনের ইলম শিক্ষা করা থেকে যদি বঞ্চিত থাকে, তবে তাকে সত্যিকার অর্থে মানবতা বা মনুষ্যত্ব থেকেই বঞ্চিত মনে করতে হবে। এজন্যই আল্লাহপাক তার কালামে পাকে গুনী ব্যক্তিকে জীবিত আর মূর্খব্যক্তিকে মৃত বলে অভিহিত করেছেন এবং রাসূলে করীম সঃ বলেছেন, "ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাজা)

বড় বড় মহিলা সাহাবী ইলম অর্জনের জন্য বহুকষ্ট স্বীকার করেছেন তারা শিক্ষার ব্যাপারে এত আগ্রহী ও উৎসুক ছিলেন যে, তা নিম্নোক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা যাবে। একদা কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী নবী করীম সাঃ এর কাছে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত করেন যে, পুরুষদের জন্য আমরা আপনার কাছে আসতে পারিনা। সুতরাং আপনি শুধুমাত্র আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারন করে দিন। সে মতে নবী করীম সাঃ বিশেষভাবে একটি মহিলা দিবস নির্ধারন করেন এবং তিনি ঐ দিন তাদের কাছে গিয়ে শরীয়তের নির্দেশাবলী শিক্ষা দিতেন। এমনিভাবে একদা ঈদের দিন হুজুর সঃ খোৎবা পাঠের পর তার ধারনা হলো পিছনে উপবিষ্ট মহিলাগণ হয়তো খোৎবা শুনতে পায়নি; বিধায় তিনি হযরত বেলাল (রাঃ) কে সংগে করে মহিলাদের নিকটবর্তী হয়ে দ্বিতীয় বার খোৎবা পাঠ করেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন। কাজেই অতি জরুরী ইলম অর্জন করা ফরজ হওয়ার, মুস্তাহাব ইলম অর্জন করা মুস্তাহাব হওয়ার এবং মুবাহ ইলম অর্জন করা মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে নারীদেরকে পুরুষদের থেকে পার্থক্য করার জন্য ইসলামী শরীয়তে কোন রুপ দলিল বা প্রমান নেই।

দ্বিতীয় বিষয় হলো- মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি কি হবে?

আল্লাহপাক রাসূলে করীম (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন "আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজ দৃষ্টি নীচু রাখে এবং আপন লজ্জাস্থান হেফাজত করে।" এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কথা।

একই আয়াতে মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, হে নবী (সাঃ) আপনি মুসলমান নারীদের বলে দিন তারা যেন আপন দৃষ্টি নীচু রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। (সূরা নূর- ৩০-৩১)

পর্দা ইসলামী সমাজ, সভ্যতার একটি নিদর্শন। নৈতিকতা ও চরিত্রহীনতা যা ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার অমুসলিম বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে মুসলিম সমাজ ঐ ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপ হতে অনেক দূরে আছে। বর্তমানে নারী স্বাধীনতার নামে ইউরোপসহ পৃথিবীর অমুসলিম দেশগুলোতে যে ধ্বংসের ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে তা কারো অজানা নয়। কাজেই দুনিয়ার এহেন

Dhaka University Institutional Repository

ভয়াবহ অবস্থায় মুসলমান বাদশাহগণের বীর জাতিকে ধ্বংসের গভীর খাদ থেকে উদ্ধার করা ও সার্বিক উন্নতি সাধনের আপ্রান চেষ্টা করা দরকার।

মাওলানা সাহেব বলেন, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষাকে প্রসার করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম মহিলা শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকলে জাতীয় জীবনে মুসলমানদের যেসব উপকার সাধিত হতো তা আজ মহিলাদের অজ্ঞতার দরুন ব্যাহত হচ্ছে। বাস্তব খোদায়ী সীমানা গুলো সংরক্ষন ও সুন্নাতে নবীর প্রচার ও প্রসার তথা জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা অন্যান্য কার্যসমূহ থেকেও বেশী প্রয়োজন। কেননা ইসলামী শাসকগণ আল্লাহর ছায়া ও নবীদের প্রতিনিধি। আর কোন জিনিসের ছায়া প্রকৃত জিনিসের মতই হওয়া উচিৎ।

মাওলানা সাহেব দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, মহিলাদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এর প্রচলন, মহিলাদের ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য মাদ্রাসার পরিবেশে যাওয়া, কিতাবাত শিক্ষা করা এবং জরুরী বিষয়াদির ইলম অর্জন করা শরীয়ত সম্মত ও ভাল কাজ। কেননা মাদ্রাসার বুনিয়াদই হচ্ছে শিক্ষা দীক্ষার বুনিয়াদ। এছাড়াও মাদ্রাসা ছাড়াও মহিলাদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে মহিলারা পর্দার সাথে নির্বিঘ্নে পড়াশুনা করতে পারবে। নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য কোন এক স্থানে একত্রে জমা হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) এ বিষয়ের উপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। উক্ত অধ্যায় বা শিরোনামে ঐ সকল হাদীসই নেয়া হয়েছে যেগুলো দ্বারা নারীদের ''ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য কোন স্থানে একত্রিত হওয়াই প্রমানিত হয়। আর বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে, সমবেতভাবে শিক্ষা যতটুকু লাভজনক হয় শুধু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার দ্বারা ততটুকু লাভ হয় না।''

মাওলানা সাহেব আরও বলেন- ইসলামী বিধানের ফরজ ও ওয়াজিব বিষয় গুলোর ইলম শিক্ষা করা (ব্যাহারিক বা সামাজিক যে ক্ষেত্রেই হোক) ফরজ বা অবশ্য করনীয়। মুস্তাহাব বিষয়গুলো যেমন- মনীষীদের আলোচনা, শিক্ষামূলক ইতিহাস ও চরিত্র গঠনমূলক ঘটনা শিক্ষা করা মুস্তাহাব আর মুবাহ বিষয়ের ইলম শিক্ষা করা মুবাহ। ইসলামের — রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো- ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থাকে হিফাজত করা এবং নারী শিক্ষা ব্যবস্থার তদারক করা ও ফিৎনার সম্ভাব্য সকল প্রকার কারনসমূহ প্রতিরোধ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহন করা। পক্ষান্তরে জনসাধারনের কর্তব্য হল- রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশাবলী মেনে চলা। এমনিভাবে যদি প্রত্যেকটি কাজের পরিসীমা জেনে তা আঞ্জাম দেয়া হয়। তবে সত্যিই নারী শিক্ষার উন্নয়ন উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি পাবে। নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান নিজের পরিষদ ও আলিমদের পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

সবশেষে মাওলানা সাহেব বলেছেন–আসল কথা হচ্ছে মেয়েদের স্বতন্ত্র ভাবে (ভিন্ন পরিবেশে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়ার ও একত্রিত হওয়ার এমনভাবে ব্যবস্থা হওয়া চাই, যাতে কোন ফিৎনার আশংকা না থাকে। আর আদর্শবান মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি এমন শিক্ষয়িত্রী পাওয়া না যায় তবে অপারগতা হিসেবে ভাল চরিত্র ও নির্ভরশীল পুরুষদেরই একাজে নিয়োগ করতে হবে এবং সঠিকভাবে তদারকি নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলেমদ্বয়ের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, ধর্মের ব্যাপারে তাদের একটি সতিাই সুন্দর মন আছে সেটা শিক্ষা দিয়ে গঠন করে তুলতে হবে। ফলে তাদের চিন্তা চেতনা আরও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে নারী শিক্ষা প্রসার লাভ করবে।

তাই সম্মানিত উদারপন্থী আলেমগন যা বলেছেন তা মোটেই নতুন কিছুই নয়,বরং তারা যা বলেছেন, রসূল (সঃ) এর বানী তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন-হযরত আয়েশা (রা) জিহাদে অংশ গ্রহনের আকাংখা করে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমরা দেখি জিহাদ একটি উত্তম কাজ, যাকে দ্বীন ইসলামের চূড়া বলা হয়েছে। তাহলে আমরা কি জিহাদে অংশ গ্রহন করে ছওয়াবের অংশীদারী হব না? (বুখারী)

উপরোক্ত হাদীস থেকে নারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস বোধ থেকে আমল করার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, হযরত আয়েশা রাঃ এর আগ্রহ প্রকাশ করার জ্ঞান না থাকত তাহলে উনি রাসূল সঃকে জিহাদ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করতেন না। তাই বলা যায় দ্বীনের ব্যাপারে কল্যান সাধন করার জন্য নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ইসলাম যেখানে পরিপূর্ন অনুমতি প্রদান করেছে।

কবি ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা ঃ [৫]

যুগে যুগে কবি ও সাহিত্যিকরা নারী সম্পর্কে ভালমন্দ উভয় ধারনাই করে গেছেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে যে সব কবি সাহিত্যিকগণ উদার দৃষ্টিভংগি প্রদান করেছেন তন্মধ্যে জাতীয় কবি নজরুল এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি নজরুল ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নারীর অধিকার ও নারী শিক্ষার ব্যাপারে জয়গান গেয়ে গেছেন। জাতীয় কবি নজরুল নারীকে অধিকার সচেতন করার জন্য নারী সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছেন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে-

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যান কর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।[৬]

উক্ত নারী কবিতার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন

''জগতের যত বড় জয়, বড় বড় অভিযান,

মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান''[৭]

এভাবে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম নারী মযার্দা তথা নারী শিক্ষাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। সে জন্যই তো তিনি সাম্যবাদী কবি ছিলেন।

অন্য একজন কবির ভাষায় নারী হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

''নারী সৃষ্টি আমাদের সুবাস বিলাবার জনাই।

আগ্রহে অধীর হয়েছি আমরা তার সুবাস গ্রহন করব।''[৮]

পক্ষান্তরে কবিদের মধ্যে যারা নারী সম্পর্কে বিরুপ ধারনা তথা নারী শিক্ষাকে পছন্দ করেননি তাদের ভাষায় নারী হচ্ছে -

''নারী সে শয়তানের অনুচর

আমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি তার

প্ররোচনা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।''[৯]

সাহিত্যিকরাও নারীকে অধিকার তথা নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে যথেষ্ট বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাদের মধ্যে লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন অন্যতম। তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে গোড়া পর্দা প্রিয় ভগ্নীদের কাছে তাদের মানসিক দাসত্বের বিষয় পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন। নারী মুক্তির দিশারী ও নারী জাগরনের অগ্রদূত লেখিকা তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান নিরীক্ষা শেষে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন যে, নারীদের শুধুমাত্র পর্দার অবমুক্তি ঘটলেই তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে তিনি কিন্তু পর্দার বিরোধী ছিলেন না। প্রথমে তাদের মন ও মানসের বিকাশ ঘটাতে হবে। নারীরা যদি শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে কাংখিত মানে উন্নতি করতে না পারে,তারা যদি তাদের কর্মের পরিধি বিস্তৃত করতে না পারে, তাহলে পুরুষশাসিত সমাজের নির্মমতা থেকে কখনও তারা মুক্ত হতে পারবে না। এ প্রসংগে একটি প্রবাদ খুবই প্রনিধানযোগ্য।

''ফুলের বাগান সবার মনে আছে

ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে।''[১০]

অর্থাৎ নারীদের সুকুমার বৃত্তির অন্তরালে ফুলের বাগান অর্থাৎ জীবনের উপযোগী সকল যোগ্যতা নিহিত আছে। আর এই ফুলের বাগানে ফুল ফোটানোর জন্য অর্থাৎ নারী সমাজের জাগরন তথা নারী শিক্ষার জন্য লেখিকা মূলতঃ এমন মন্তব্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ

১। আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা'' পৃষ্ঠা নং-২১,২২

২। মুহাম্মাদ আতাউর রহমান কাসেমী ''ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা''। পৃষ্ঠা নং-২৯-৩০, ৩৬-৪১।

৩। মুহাম্মাদ আতাউর রহমান কাসেমী ''ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা''। পৃষ্ঠা নং-৪৫।

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা- পৃষ্ঠা নং-৪৬

৫। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা- পৃষ্ঠা-৪৭, ৪৮, ৪৮-৯, ৫০-৫৯.

৬ ও ৭। কাজী নজরুল ইসলাম সঞ্চিতার ''নারী কবিতা''। পৃষ্ঠা নং-৬৩, ৬৪।

৮ ও ৯। আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রসূলের সঃ যুগে নারী স্বাধীনতা''। পৃষ্ঠা নং-১৭

১০। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর ''অর্ধাংগী'' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৫

ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজন কেন?

প্রত্যেক জাতির সকল ক্ষেত্রে কল্যান ও উন্নতির জন্য দেশের সমগ্র অধিবাসী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একযোগে কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশ ও জাতি গঠনমূলক সর্বাধিক কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা বিবেচনা করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-

''কোনো কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরনা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষী নারী,,।[১]

তাই উপরোক্ত কবি নজরুলের কবিতার দুইটি পংক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে,অতীতে যেমন কাধে কাধ মিলিয়ে মানব জাতির উন্নতির জন্য নারী পুরুষের পাশে থেকে কাজ করেছে তেমনি বর্তমানেও কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এক সাথে থেকে কাজ করার প্রয়োজন থাকবে। সে জন্য নারী শিক্ষার আশু প্রয়োজন। বিশ্বে নারীর সঠিক পরিসংখ্যানটা কতটুকু সেটা ডঃ ইউসুফ আল কারদাভীর মতামত থেকে জানা যায়।

তিনি বলেছেন-''পরিসংখ্যান গতভাবে সমাজের অর্ধেক নারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী, সন্তানাদি এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় তারা অর্ধেকেরও বেশী।''[২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজে নারীর সংখ্যা শুধু অর্ধেক নয় অর্ধেকেরও বেশী। সুতরাং এ নারী সমাজকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির কথা ভাবাই যায় না।

"Wives are young men mistress, companion for the middle age and old mens nurses"

তাই বেকনের মধ্যযুগীয় উপরোক্ত ধারনাকে পরিবর্তন করে আমাদের নারী সমাজকে দেশ গঠনের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা দীক্ষায় তাদেরকে যথার্থ যোগ্য নাগরিক হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার মত মানবী হিসাবে তৈরী করতে হবে। আর এ মর্যাদা পাওয়ার জন্য সর্ব প্রথমে নারীদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। তা না করলে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই বলা যায় সমাজের নানাবিধ কল্যানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ প্রসংগে ইসলামেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে সবিশেষ তাগিদ প্রদান করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সর্ব প্রথম আয়াত-

اقرا باسم ربك الذى خلق ۝

Dhaka University Institutional Repository

এখানে (নারী, পুরুষ) আল্লাহ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে লেখাপড়া করতে বলেছেন। তার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে।

রাসূল করীম সঃ এর পবিত্র হাদীস থেকেও নারী শিক্ষার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

নিম্নরূপ- ''জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর ও নারীর উপর ফরজ''[৩] ইবনে মাজা

এছাড়া সমাজের নানাবিধ প্রয়োজনে নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

নিম্নরূপ[৪]

১। সন্তানকে স্তন্যদান ও প্রতিপালনে ঃ

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে মাতার দেহ নিংড়ানো স্তন্যই শিশুর জন্য একমাত্র উপযোগী খাদ্য। আর এ স্তন্যদানের মেয়াদ হচ্ছে দু'বছর পর্যন্ত। সন্তান সে পুত্রই হোক বা কন্যাই হোক। কালো কিংবা ফর্সা, কদাকার কিংবা সুশ্রী যাই হোক না কেন, মাতা তার নিজ সন্তানকে কোমল হাতের পরশ দিয়ে পরম যত্নে লালন পালন করবে। যেহেতু মাতার শোনিতে মহান আল্লাহ পাকের এ দুগ্ধ প্রস্তুত হতে থাকে। তাই মাতাকে সে সময় হালাল খাদ্য গ্রহন করতে হবে যা শিশুর দৈহিক গঠনের সাথে সাথে মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে কোন রূপ অবৈধ বস্তুর লেশমাত্র প্রভাব না ঘটে বরং তা সুন্দর ও পুতপবিত্র হয়ে উঠে। ''হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রাসূল সঃ বলেছেন, - স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের লোকজন ও সন্তান সন্ততির উপর দায়িত্বশীল এবং তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।'' (বুখারী ও মুসলিম)।

মাতার স্তন্যদান সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহপাক তার কালামে পাকে এরশাদ করেছেন-

''আর যে স্তন্যকাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে, তার জন্য জননীগণ নিজ সন্তানদের পূর্ণ দু' বছর স্তন্যদান করবে।'' (সূরা বাকারা- ২৩৩)

তাই দেখা যায় যে, উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য মায়ের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। সেজন্য সন্তানের প্রতিপালনে নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

২। সন্তানের চরিত্র গঠনে ঃ

সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হল পরিবার। আর তাই পরিবারের নারীর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্তানের চরিত্র গঠন তথা ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্য বিনির্মানে নারী সমাজের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। যুগের তাগিদে বর্তমান কালে নারী সমাজের ভূমিকার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। ঘরে ও বাইরে তারা আজ কর্মমুখর জীবনের স্বাদ গ্রহন করছে। আজ অন্তঃপুরের বাইরে আগমন অনেকের পক্ষে সম্ভব হলেও একদা শান্তির নীড় হিসেবে সংকীর্ণ গৃহকোন হতেই নারীর ভূমিকা পালনের সূত্রপাত হয়েছে। মায়ের কাছ থেকে সন্তান যে শিক্ষা লাভ করে তাই পরবর্তী জীবনে তার

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র গঠনে এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। এ প্রসংগে নারী শিক্ষার সুদূর ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমেরিকার প্রখ্যাত কবি L.W Wallace বলেছেন "The hand that rocks the cradle rules the world" অর্থাৎ যে হাত দোলনা দোলায় সে হাত দেশ শাসন করে। অর্থাৎ একজন মা শিক্ষিত হওয়া মানে একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া, একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া মানে একটি সমাজ শিক্ষিত হওয়া আর একটি সমাজ শিক্ষিত হওয়া মানে একটি দেশ উন্নত হওয়া। এমনি ভাবে নারীরা জাতিগঠনে সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করে। নারীর বা মায়ের এই সুদুর প্রসারী ভূমিকা দেখেই Nepoleon মন্তব্য করেছেন-

"If you give me a good mother. I shall give you a good nation."

ফুলের বাগান সবার মনে আছে। কিন্তু ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে। অর্থাৎ সুপ্ত প্রতিভা সব শিশুর ভিতরই লুকায়িত আছে। কিন্তু সেটাকে সুষ্ঠু বিকশিত করতে পারে একজন শিক্ষিত মা। তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে নারী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

৩। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদানে ঃ

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার উপর ন্যস্ত। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার পরিবার সম্পর্কে বলেছেন- Family is the eternal school which teaches you civic virtue.

আর এ পরিবারে মাতার দায়িত্ব টাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু শিশুরা মায়ের সান্নিধ্যেই বেশীক্ষণ এবং মায়ের সাথেই প্রথম কথা বলতে শুরু করে। তাই মাতাই হলো শিশুর প্রধান শিক্ষয়িত্রী। মায়ের আচরণ, তার কথা-বার্তা এমন কি চাল-চলন অত্যন্ত সংযতভাবে ও সর্তকতার সাথে করতে হবে। কেননা শিশু মায়ের এগুলো সদা অনুকরন করে থাকে। অতএব মাতার উচিৎ সন্তানকে শৈশব কাল থেকেই কালিমা তাইয়্যিবা শিখানো এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক ছবক প্রদান করা। অতঃপর ধীরে ধীরে আদব কায়দা ও নৈতিকতা শিক্ষা দান করতে হবে। এ কোমলমতি শিশুরাই মায়ের নিকট হতে যে আচার ব্যবহার ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করে থাকে তাই তার ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ মানুষ হওয়ার অন্যতম পাথেয় হয়ে থাকে। সুতরাং মাতার মধ্যে যাতে এমন কোন আচার আচরন বা কথা বার্তা কিংবা চাল চলনে প্রকাশ না পায় যা কোমলমতি এ অনুকরণ প্রিয় শিশুর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অমানুষ করে তোলে কিংবা অসদাচরনে বাধ্য করে। মনোবিজ্ঞানীরা শিশুকে Tabularasa বা ''সাদা কাগজের পাতা'র,, সাথে তুলনা করেছেন।

তারা ব্যাখ্যা করেছেন- সাদা কাগজে যে কোন দাগ লাগলে যেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় তেমনি শিশুরা হচ্ছে অনুকরন প্রিয় তাদেরকে যা শিখানো হয় তাই শিখে। সেজন্য তাদেরকে সব সময় ভাল আচরন শিখাতে হয়। শিশু শিক্ষার এ স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পিতামাতা উভয়কে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান হতে হবে এবং ধর্মীয় বিধি বিধানগুলো যথাযথ পালন করে সততার সাথে পারিবারিক জীবন যাপন করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদানে মাতার ভূমিকা কত বেশী। সেজন্য সন্তানের শিক্ষাদানের জন্য মা তথা নারী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

৪। পিতৃহীন সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ঃ

পিতৃহীন সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ এ এমন এক গুরুদায়িত্ব যা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ছাড়া সম্ভব নয়। মায়ের এ দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা সাধারন কোন সহজ অবস্থা নহে। দূর্ভাগ্য বশতঃ কোন কারনে সন্তান শৈশবে পিতৃহারা হলে মাকেই জীবনের সুখ শান্তি উৎসর্গ করে সন্তানের সুখের দিকে তাকিয়ে তাকে মানুষ করতে হয়। (তবে উল্লেখ্য যে কোন বিধবা রমনী যদি অন্য জায়গায় বিয়ে করতে চায় তাহলে করতে পারে)। এরুপ ত্যাগ তিতিক্ষা ও গুরুদায়িত্ব পালনের বিনিময়ে মহান আল্লাহ পাক মাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। এমন কি কিয়ামতে ঐ মা মহানবী (সঃ) এর পাশাপাশি অবস্থানকরবে বলে হাদীসে বাশারাত দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে- যে বিধবা সুন্দরী রমনী রুপগুন থাকা সত্ত্বেও পিতৃহীন সন্তানদেরকে লালন পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে না এবং এতীমদের প্রতিপালন করতে যেয়ে কষ্ট ও পরিশ্রমের দরুন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। এমনকি এতীমরা সংসারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া বা নৃত্যবরন না করা পর্যন্ত অমানুষিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেই থাকে। মহানবী সঃ তখন মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বয়ের দ্বারা ইশারা করে দেখালেন। আমি এবং ঐ বিধবা রমনী হাশরের দিন এরুপ পাশাপাশি অবস্থান করব। (আল হাদীস)

৫। পারিবারিক জীবনে ঃ

একজন নারীই পারিবারিক জীবনে সুখ শান্তি দিয়ে পুরুষের জীবনকে সুন্দর ও স্বার্থক করে তোলে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

هن لباس لكم وانتم لباس لهن (সূরা বাকারা- ১৮৭)

এতে পুরুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির পথ ও প্রশস্ত হয়। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের নারী সমাজ দেশ ও জাতিগঠনে নিজেদের ভূমিকা গৌরবের সংগে পালন করে চলেছে। নারী প্রসংগে প্রবাদে বলা হয়েছে-

''সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে''

তাই এ রকম সুন্দর সুশৃংখল পারিবারিক জীবন তৈরী করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন।

৬। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালনার্থে ঃ

মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দ্বীনের শিক্ষা অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন নিতান্ত আবশ্যক। এ জন্যই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম প্রতিটি নর নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছে। রাসূল সঃ জ্ঞান অর্জনকে ফরজ ঘোষনা করে বলেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (ইবনে মাজা)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে ইলমের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

انما يخشى الله من عباده العلمؤا (সূরা ফাতির-২৮)

''আল্লাহ'তালার বান্দাগনের মধ্যে কেবল আলিমগনই তাকে ভয় করে থাকে।''

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (সূরা যুমার-৯)

''যাদের ইলম আছে। আর যাদের ইলম নেই তারা কি সমান। (নিশ্চয়ই নহে)''

এই কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য নয়, এটা নারীর জন্যও বরাদ্দ। তাই এই নির্দেশ পালন করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন।

এছাড়া বর্তমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার লাভ করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা নিয়োগ করা হচ্ছে। তারা পুরুষের চেয়ে অধিক দক্ষতা সহকারে শিশুদের মন মানসের বিকাশ ঘটিয়ে ভবিষ্যতে জাতির পরিচালক হিসাবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। স্কুল কলেজে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা ২০%। তাই শিক্ষার বিস্তরে নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সবচেয়ে বেশী।

৭। <u>সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ঃ</u>

তবে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলাম নারীকে জাতির নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের যোগ্য বলে মনে করে না। কারণ নেতৃত্বের জন্য যে সব গুনের প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। যে সব অঙ্গনে নারীর শক্তি ও যোগ্যতা কাজ করতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রেও তার উপর আস্থা স্থাপন করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। যদি তা করা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির ধ্বংসের গহবরে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন পরিনাম হতে পারে না।

এ প্রসংগে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

''পুরুষরা যখনই নারীর অনুগত্য করেছে তখনই ধ্বংস হয়েছে।''

আরো একটি বানীতে নবী সাঃ এর চেয়েও জোরালো ভাষায় বলেছেন-

''যে জাতি নারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সে জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না''

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী রঃ বলেন- এতে প্রমানিত হয় যে, নারী নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কোন জাতির জন্য নারীকে নেতা হিসাবে গ্রহন করাও জায়েজ নয়। কারণ অসাফল্য ও ক্ষতি নিশ্চিত করে এমন কাজ বর্জন করা আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

গোটা মুসলিম উম্মার সমস্ত উল্লেখ যোগ্য দল উপদল এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকামত পোষন করেছে। আল্লামা ইবনে হাযম লিখেছেন-

''কিবলার অনুসারীদের যত ফির্কা বা ছোট ছোট দল উপদল আছে, তার কোনটিই নারীর নেতৃত্বকে বৈধ মনে করে না''

তাহলে দেখা যাচ্ছে নারী যদিও জাতির নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের উপযুক্ত নয় তবু তার অর্থ এ নয় যে, সে কোন সামাজিক কাজের যোগ্যতা রাখেনা। নারীরা স্বাভাবিক কর্ম ক্ষেত্রের বাহিরেও অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব তাকে দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে ইলহাম হানাফী (রঃ) লিখেছেন-

''শরীয়ত নারীদের সম্পর্কে যা বলেছে তা শুধু এই যে, তার জ্ঞান বুদ্ধি অপূর্ণাংগ। কিন্তু সবাই জানে যে, তার জ্ঞান বুদ্ধির স্বল্পতা এতটা কম নয় যে, সে কোন পদ মর্যাদার উপযুক্তই নয়। এটা কি ঠিক নয় যে, সে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী হতে পারে এবং তাকে ইয়াতীমদের দেখা শোনার জন্য অছিয়ত করা যেতে পারে।''

ফিকাহ শাস্ত্রের এই স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমানিত হয়ে যে, নারী সামাজিক কাজকর্মের যোগ্যতা রাখে। তবে কথা হচ্ছে তার উপর কোন দায়িত্ব অপর্ন করার পূর্বে সর্বাবস্থায় দেখতে হবে সে উক্ত দায়-দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম কিনা? সাথে সাথে তার মেজাজ ও প্রকৃতিগত আকর্ষনের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

আর এই সামাজিক নানা রকম দায়িত্ব পালন করতে তাকে জ্ঞান বুদ্ধি যোগ্যতা ও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তাই সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

৮। রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা রাখার জন্য ঃ

রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা রাখার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও ইসলাম নারী নেতৃত্বকে অনুমতি প্রদান করেনি তারপরও পর্দায় থেকে তারা তাদের দাবী আদায় করতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই।

পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ের প্রভাবশালী একটি মৌলিক আন্দোলন যা গোটা সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন এবং মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তন দাবী করছে। তা হচ্ছে নারী সমবাদী আন্দোলন তথা নারী মুক্তি আন্দোলন নামেই ইহা অধিক পরিচিত।

''নারী মুক্তি আন্দোলন'' বর্তমান যুগের কোন একক সৃষ্টি নয়। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রাচীন কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্লেটো তার ''দি রিপাবলিক'' গ্রন্থে পারিবারিক জীবন ও নারী পুরুষের দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক সম্পর্কের অবসান দাবী করছেন।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড এবং দৃষ্টি আকর্ষনীয় নারী সাম্যবাদী বিক্ষোভ সমাবেশ হয় ১৯৭০ এর ২৬শে আগষ্ট।এই দিন হাজার হাজার মহিলা প্লাকার্ড বহনকরে নিউইয়র্কের ফিফথ এভিনিউতে সমবেত হন। এ সকল প্লাকার্ডে লেখা ছিল, গৃহ বধুরা বিনা মাহিনায় দাসী মাত্র। গৃহ কর্মের জন্য সরকারী ভাতা চাই, নির্যাতিতা নারী ভাত রেখো না। ইত্যাদি।

এছাড়া অন্য একটি রির্পোট থেকে জানা যায় ১৯৯৩ সনে বিশ্বে মহিলা সংসদ সদস্যার সংখ্যা ১০.১% এবং ৬ জন মহিলা রাষ্ট্র প্রধানের পদ অধিকার করে আছেন এবং UNOতে ৮ জন মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন। যারা দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে লৌহ মানবী নামে খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে।

মূল কথা হচ্ছে আধুনিক প্রগতিবাদী, নারীদের এরকম পাশ্চাত্য মুখী আন্দোলনকে ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। কারণ এগুলি নারীর প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে না। তাই ইসলাম এরকম ভাবে নারীদের রাজনীতি বিশ্বাসী নয়। পর্দার মাধ্যমে নারীরা আন্দোলন করতে পারে। যেমন ইরান সহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে নারীরা করে যাচ্ছে। তাই বলা যায় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য অনেক জ্ঞানের দরকার হয়। সেজন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

৯। <u>সামরিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ঃ</u>

ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও হিফাজতের দায়িত্ব নারীর কাঁধে অর্পন করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত শির করার আকাংক্ষা তাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে শত্রুর মুখোমুখি দাড় করে দিতো। পুরুষের পাশাপাশি সেও তখন কুফরের ঝান্ডা পদানত করার কাজে অংশ গ্রহন করতো, তাহলে দেখা যাচ্ছে সামরিক ময়দানে নারীরাও কম অবদান রাখেনি।

নিম্নের হাদীস ও ঘটনাবলী থেকে সে সম্পর্কে বুঝা যাবে-

''এক আনসারী মহিলা সাহাবা উম্মে আমারা উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরুষের মত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সাদ ইবনে রাবীর কন্যা উম্মে সাদ তাকে তার এই কৃতিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা সবিস্তারে এভাবে বর্ননা করেন – তিনি অর্থাৎ উম্মে আমারা বলেন –

''আমি মুজাহেদীনদের সেবা ও সহযোগিতার জন্য খুব সকালেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছি। প্রথমে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করলো। কিন্তু পরে এই অর্জিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা বিশৃঙ্খল ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন আমি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে গিয়ে তাকে রক্ষার জন্য তীর ও তরবারি চালাতে থাকলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার উপর শত্রুর আঘাত এসে পড়লো। উম্মে সাদ বর্ণনা করেছেন, আমি তার কাধের উপর গভীর ক্ষত চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস

Dhaka University Institutional Repository

করলাম; কে আপনাকে এমন কঠিন আঘাত করেছিল? তিনি বললেন, এ আঘাত করেছিল ইবনে কিমআহ। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন; পরাজিত হয়ে মুসলমানরা নবী করীম সাঃ এর আসে পাশে থেকে যখন সরে পড়লো তখন সে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসলো। বললো, মুহাম্মদ (সাঃ) কোথায়? এ যুদ্ধে সে বেচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তাঁর জীবিত থাকা আমার জন্য ধ্বংস ও মৃত্যুর শামিল। এ কথা শুনে আমি নিজে, মুসআব ইবনে উমায়ের রাঃ এবং আরো কয়েকজন সাহাবা রাঃ তার মোকাবেলা করলাম। আমরা ক'জনই নবী (সাঃ) এর পাশে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ছিলাম। সম্মুখ মোকাবেলার এই মুহূর্তেই সে আমার উপর আঘাত করে। সে আঘাতের ক্ষত চিহ্ন তুমি দেখতে পাচ্ছ। তরবারি দিয়ে আমিও তাকে কয়েকটি আঘাত করলাম কিন্তু আল্লাহর দুশমন দুটি লৌহবর্ম দ্বারা তার দেহ সুরক্ষিত রেখেছিল।''[৫]

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিরক্ষায় যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন নবী (সাঃ) নিজে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে-

''ডানে ও বামে যে দিকেই আমি তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই দেখছিলাম উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষার জন্য প্রানপনে লড়াই করছে।''

তার ছেলেকে একজন আহত করে ফেললো। সে যখন তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, উম্মে আমারা, এই লোকটি তোমার ছেলেকে আহত করেছে। সংগে সংগে উম্মে আম্মারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে এত জোরে আঘাত করলেন যে, সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নবী সাঃ মুচকি হেসে বললেন, উম্মে আমারা, তুমি তোমার ছেলের প্রতিশোধ নিয়েই ফেললে উম্মে আমারা নিজেই বর্ণনা করেছেন; এরপর আমরা তার উপর অবিরাম তীর বর্ষন করলাম এবং তাকে ধ্বংস করে ছাড়লাম। এ অবস্থা দেখে নবী সাঃ বললেন আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তোমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন, তোমার কলিজা ঠান্ডা করেছেন এবং তোমার ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তোমাকে দিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আনসারী মহিলা উম্মে আমারা দ্বীন তথা আল্লাহর প্রিয় রাসূলের প্রতিরক্ষার জন্য কি কঠিন অবস্থান রেখেছেন যা ভাবতে অবাক লাগে। উম্মে আম্মারার যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকত এবং শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার কৌশলগত বিদ্যা জানা না থাকত তাহলে তার জন্য বিজয় অর্জন করা অনেক কঠিন হত। তাই সামরিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্যও নারী শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

এছাড়া অন্যান্য মুসলিম মহিলারা সামরিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে। তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে ইকরিমা ইবনে আবূ জেহেলের স্ত্রী উম্মে হাকীমও শরীক হয়েছিলেন। আজনাদাইনের যুদ্ধে ইকরিমা (রাঃ) শাহাদত লাভ করেন। এর পর ''মুরজে সিফার,, নামক স্থানে খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) এর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দ্বিতীয় দিনে

Dhaka University Institutional Repository

খালেদ ইবনে সাঈদ ওয়ালীমার আয়োজন করলেন। লোকজন তখনও খাওয়া দাওয়া শেষ করতে পারেনি। এমন সময় রোমানরা যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা শুরু করে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে নব বধূর সাজে সজ্জিতা উম্মে হাকীম তার তাবুর একটি মোটা দন্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাই শত্রু সেনাদের সাতজনকে হত্যা করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ এর হাতে নয়জন রোমানকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হয়েছিল।

''হযরত আনাস রাঃ এর মা উম্মে সুলাইম রাঃ খঞ্জর-ছা, ছুরি হাতে উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন''[৬]

হুনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রেও তার কাছে খঞ্জর ছিল। নবী (সাঃ) তাকে এভাবে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসার কারন জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন।

''আমি ছুরি সাথে রেখেছি এ জন্য যে, কোন মুশরিক আমার কাছে আসার দুঃসাহস দেখালে এই ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে দেব।''[৭]

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে খ্যাতি লাভকারী বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হাবীব ইবনে সালামাকে এক যুদ্ধের সময় তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো বলুন তো, আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন? জওয়াবে তিনি বললেন, ইনশাল্লাহ শত্রুদের ব্যূহের অভ্যন্তরে অথবা জান্নাতে। জওয়াব শুনে স্ত্রীও পূর্ন দৃঢ়তার সাথে বললেন। এ দুটি জায়গার যেখানেই আপনি থাকেন না কেন আমি আশা করি আমার অবস্থান স্থলও তাই হবে।''[৮]

''খন্দক যুদ্ধের সময় নবী সাঃ মেয়েদের একটি দুর্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। কিন্তু তারপরও ইহুদীরা সুযোগের অপেক্ষায় দুর্গের চারদিকে সব সময় আনাগোনা করছিল এবং শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে এক ইহুদী দুর্গ প্রাচীরে উঠে পড়েছিল। মহানবী (সাঃ) এর ফুফু হযরত সাফিয়া রাঃ দুর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং দুরভিসন্ধিকারী ইহুদীর মাথা কেটে দুর্গের পাদদেশে নিক্ষেপ করলেন, যেখানে ফিতনাবাজ অন্যান্য লোকেরা উপস্থিত ছিল। এ দেখে তারা একেবারে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়লো।

তারা বলতে লাগলো, মুহাম্মদ সাঃ এমন অপরিনামদর্শী নন যে,মেয়েদেরকে অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাবেন। দুর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন সাহসী বীর পুরুষ আছে যে আমাদের সব ইচ্ছা পন্ড করে দিতে সক্ষম।''[৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলিম মহিলারা কিভাবে উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। ইসলামের শত্রুদের বার্থ করে দেয়ার কাজে নারী সরাসরি যতটা অংশ গ্রহন করেছে পরোক্ষভাবে তার চেয়ে বেশী অংশ গ্রহন করেছে বাতিলের শক্তিসমূহের মোকাবিলার কাজে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর না ছুড়লেও তীরন্দাজ হাতকে তীর যুগিয়েছে। সে তলোয়ার না চালালেও

Dhaka University Institutional Repository

তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের তলোয়ার চালানোর উপযুক্ত বানিয়েছে। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন সৈনিক আহত হলে সে তার ক্ষত নিরাময়কারী মলমের ভূমিকা পালন করতো, মাটিতে পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করতো এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হলে তার জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ছুটতো।

রাবী বিনতে মুআওয়েয বর্ণনা করেছেন-

''আমরা নবী (সাঃ) এর সাথে লড়াইয়ের ময়দানে যেতাম। সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং যুদ্ধে নিহতও আহতদের মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।,,[১০]

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী আরেকজন মহিলা সাহাবী বলেন,

''আমরা আহতদের মলম লাগিয়ে পট্টি ও ব্যান্ডেজ করতাম। অসুস্থদের ঔষধ ও পথ্য দিতাম এবং সেবা করতাম।''[১১]

মহিলা সাহাবীদের মধ্যে উম্মে আতিয়া তার নিজের সম্পর্কে বলেন-

''আমি রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছি। সেখানে আমি মুজাহিদদের জিনিসপত্র ও সাজ সরঞ্জামের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম আহতদের ঔষধ ও পথ্য দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা, শুশ্রূষা করতাম।''[১২]

কোন কোন মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও এসব সেবা কার্য চালাতেন। উদাহরন স্বরুপ আসলাম গোত্রের রুফাইদা নাম্নী এক মহিলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগন লিখেছেন-

তিনি আহতদের ওষুধ দেয়া ও পট্টি বাধার কাজ করতেন এবং যে সব মুসলমানদের সেবা যত্ন ও ভালমত তত্ত্বাবধান না হলে মারা যাওয়ার আশাংকা থাকতো, এরুপ সেবা যত্নের মুখাপেক্ষী মুসলমানদের সেবাযত্ন ও দেখাশোনা করতাম। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদে নবীতে একটি তাবু খাটিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সাদ ইবনে মুআয আহত হলে নবী সাঃ তাকেও রুফাইদার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সহজেই তিনি তার সেবা যত্ন করতে পারেন।

এভাবে নারীরা সামরিক ক্ষেত্রে মুজাহিদদের সেবাসহ অন্যান্য কাজে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকত। আর এ সমস্ত কাজ করার জন্য অবশ্যই বুদ্ধিগত জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় সামরিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

১০। সত্যের প্রকাশের জন্য ঃ

সত্যের প্রকাশ করার জন্য কুরআনে ঈমানদার লোকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে

''হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা সৎ লোকদের সংগী হও। (সূরা আল কুর'আন)

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া ঈমানদার লোকদের আল্লাহপাক আরো বলেছেন-

''তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না

এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না''

(সূরা আল - বাকারাহ ৪২)

আর এই সত্য প্রমান করার জন্য ভাল মন্দের জ্ঞান থাকা দরকার। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় এটা দেখে চলতে পারে কেননা তার কাছে জ্ঞান নামক সত্যের মশাল থাকে। তাই সত্যের প্রকাশের জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন বেশী। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় নারীগণ শুধু নিজেদেরকেই ন্যায় ও সত্যের উপর দৃঢ়পদ রাখার চেষ্টা করেনি। বরং সমাজের যেখানেই তারা কোন বিপর্যয় ও অবক্ষয় দেখেছেন সেখানেই তার পরিবর্তন ঘটিয়ে সে স্থানে কল্যান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সাধনা করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা বিনতে নাইক রাঃ সম্পর্কে ইবনে আব্দুল বাররা রাঃ লিখেছেন-

''তিনি বাজারে ঘোরা ফেরা করে ভাল কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে বাধা দিতেন। তিনি হাতে একটি কোড়া রাখতেন এবং তা দিয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের প্রহার করতেন''[১৩]

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার নারী সমাজ রাজাও প্রজা বা শাসক ও শাসিত কারো পরোয়া করেননি। তাদের ঈমানী আবেগ যেভাবে প্রকাশ্য দুশমনের মোকাবিলা করেছে তেমনি ইসলামের অনুসারীদের চিন্তা ও কর্মের বিপর্যয় ও মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ন্যায় ও সত্যের বানীকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অতি বড় বাতিল শক্তিও যেমন তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারেনি তেমনি অত্যাচারী ও কঠোর শাসকদের অত্যাচার এবং বাড়াবাড়িও তাদের দমাতে পারেনি।

মহিলা সাহাবীরা কঠিন পরিস্থিতিতে যে কত বড় সত্যের প্রকাশ করতেন তা একটি ঘটনা থেকে বুঝা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে গুলিবিদ্ধ করার পর হাজ্জাজ তার মা আসমার কাছে গিয়ে বললো আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছিল। পরিনামে আল্লাহ তাকে এই কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত আসমা বললেন-

''তুমি মিথ্যা বলেছো। (সে বে-দ্বীন ছিল না) সে পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরন করতো। বেশী করে রোজা রাখতো। অধিক মাত্রায় তাহাজ্জুদ পড়তো। (প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই তার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছো) আল্লাহর শপথ নবী করীম সাঃ আমাদের বলেছিলেন, সাকীফ গোত্রে দুইজন মিথ্যাবাদী জন্ম লাভ করবে। এ দুজনের পরবর্তী জন পূর্ববর্তীজনের চেয়ে অধিক অত্যাচারী হবে। সাকীফ গোত্রের প্রথম মিথ্যাবাদী মুখতারকে তো আমি ইতিপূর্বেই দেখেছি। আর দ্বিতীয় মিথ্যাবাদী হচ্ছে তুমি।''[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১১। ঘরের বাইরে কাজ করার অনুমতির জন্য ঃ

ইসলাম নারীর চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা শুধু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে নি। বরং তার কর্ম তৎপরতার ব্যাপক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই সে জ্ঞান ও সাহিত্যের ময়দানে যেমন অগ্রসর হতে পারে তেমনি কৃষি এবং ব্যবসায় বানিজ্যের ময়দানে সমৃদ্ধির অধিকার রাখে। শিল্প কারিগরী এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহন করার অনুমতি যেমন তার রয়েছে। তেমনি রয়েছে জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার অনুমতি। এ ক্ষেত্রে অনুমতির অর্থ এ নয় যে, তার চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা শুধু বরদাশত করা হয়েছে বা মেনে নেয়া হয়েছে। বরং তার অর্থ হলো জীবন এবং গতি ও অনুভূতির যে সব চাহিদা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তাকে অবদমিত এবং ধ্বংস করার কোন প্রচেষ্টা চালানো হয় নি। বরং ওগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য তাকে আহবান জানানো হয়েছে।

একটি ঘটনা থেকেই বিষয়টি অনুমান করা যায়। স্ত্রী উম্মে হারাম রাঃ এর ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ তিনি মুচকি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন উম্মে হারাম খুশীর কারন জিজ্ঞেস করলে বললেন, আমার উম্মাতের যে সব উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ জিহাদ করার জন্য সমুদ্র যাত্রা করবে আমাকে স্বপ্নে তাদের দেখানো হলো। জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রার সওয়াব এত বেশী যে, তারা জান্নাতে বাদশাহদের মত সিংহাসনে সমাসীন থাকবে। উম্মে হারাম রাঃ বললেন, দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকেও যেন তাদের শামিল করেন। নবী করীম সাঃ তাকেও ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির দোয়া করলেন। এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় যখন জেগে উঠলেন তখন ও তার চেহারায় আনন্দ ও খুশির চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। উম্মে হারাম জানতে চাইলে নবী করীম (সাঃ) উম্মে হারামকে পুর্বের সেই একই কারন জানালেন উম্মে হারাম এবারও দোয়া করার জন্য আবেদন জানালে তিনি বললেন। এত অধৈর্য হচ্ছো কেন? তুমি অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছ।

চিন্তা করলে দেখা যায় জিহাদ করতে হবে তাও আবার সমুদ্র পারে গিয়ে। এটি জীবনের সর্বাধিক ধৈর্য এবং ত্যাগ ও কোরবানীর কাজ। আর তাতে নারীর অংশ গ্রহনের সুযোগ হওয়ার জন্য খোদ নবী (সাঃ) দোয়া করছেন। অথচ তার জন্য জিহাদ ফরজ নয়। এ থেকেই ইসলামের মেজাজ ও দৃষ্টি ভংগি উপলব্ধি করা যায়। ইসলাম চায় না নারী সামাজিক কর্মকান্ড থেকে একেবারেই অনেক দূরে থাকুক এবং নিজস্ব গন্ডিবর্হিভূত অন্য কাজ আদৌ না করুক। তবে এ বিষয়টি বাস্তব ও সত্য যে সামাজিক কর্মকান্ডে কামিয়াবীর জন্য যে সব গুনাবলী থাকা দরকার। যেমন ঃ কষ্ট সহিষ্ণুতা, সরলতা, স্বাধীনতা, ইত্যাদি প্রকৃতিগতভাবে নারীর মধ্যে তার অভাব থাকে। আর এসব গুনাবলী কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষকে বিরোধী শক্তির সাথে দ্বন্ধ সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু যেহেতু পারিবারিক জীবনের কর্মকান্ডের সাথে সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার কারনে নারী এসব দ্বন্ধ সংঘাত থেকে দূরে অবস্থান করে তাই তার মধ্যে এ সব গুনাবলী সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ খুব কমই থাকে। বরং গৃহাভ্যন্তরের শান্ত জীবন অতি সহজেই তার মধ্যে লৌকিকতা আয়েশ আরাম প্রিয়তা, হালকা মেজাজ ও প্রকৃতি এবং অস্থির চিত্ত হওয়ার গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। ইসলাম চেষ্টা করে যাতে তার মধ্যে এসব মন্দ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে না পারে এবং সে জীবনের কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি সমূহের মোকাবেলা দৃঢ়তার সাথে করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে শরীয়ত তাকে কর্মময় ও সহজ সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছে।

তাই পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন এবং কল্যানকর কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য নারী ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহিলারা প্রয়োজনে বাজার এবং ক্ষেত খামারে যাতায়াত করতো। যেমন একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়- জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমার খালা তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে ছিল। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে তিনি নিজের বাগানের কয়েক কাঁদি খেজুর কাটার ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলো যে, এ সময় ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ নয়। বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে গেলে তিনি তাকে বললেন-

''বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট এবং বিক্রি কর। তুমি সম্ভবতঃ সে অর্থ দান খয়রাত করতে অথবা কোন কল্যানকর কাজে লাগাতে পার।"

অন্য কয়েকটি বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।''

ঘটনাটি হচ্ছে হযরত সাওদা রাঃ কে বাইরে যেতে দেখে হযরত উমর রাঃ তার সমালোচনা করলে তিনি কোন কথা না বলে ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী (সাঃ) এর উপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষন দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন,

''প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।,,[১৫]

ঘরের বাইরের কাজগুলির মধ্যে কৃষিকাজ,ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প ও কারিগরি ইত্যাদি।

১২। <u>কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ঃ</u>

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হযরত জাবের (রা) এর খালার ঘটনা কৃষিকাজের সাথে তার সম্পর্ক থাকা প্রমান করে।

সাহল ইবনে সাদ অন্য একজন মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন যার নিজের কৃষিক্ষেত্র ছিল। সে তার কৃষিক্ষেত্রের সেচ খালের পাড় দিয়ে গাজরের চাষ করতো। সাহল ইবনে সাদ এবং অন্য সাহাবাগন জুমআর দিন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে সে তাদের গাজর ও আটার তৈরী এক প্রকার হালুয়া খেতে দিত।''[১৬]

এছাড়া আধুনিক কালে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান অপরিসীম। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যদি কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহন করতে পারা যায় তাহলে কৃষির উৎপাদন ২৪% বৃদ্ধি পাবে।

তাই দেখা যাচ্ছে ইসলামের যুগে নারীরা কৃষিকাজে সংযুক্ত ছিল আর বর্তমানে তো নারীরা কৃষিকাজে সংযুক্ত আছেই। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। সেজন্য গ্রাম্য কৃষক বধুদের চাষ বিষয়ক

Dhaka University Institutional Repository

কাজে নানা রকম প্রশিক্ষন দিতে হবে, তাহলে এদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে দেশের একমাত্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরাও কৃষি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছে। তাই বলা যায় চাষাবাদের ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন।

১৩। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ঃ

বর্তমান বিশ্বের ৫০% এর অধিক মহিলা Labour force রয়েছে যারা বিভিন্ন Informal sector এ সহায়তা করছে। এজন্য World Bank মন্তব্য করেছেন, যে, ''শিল্প ও ব্যবসায় চেয়েও নারীদের জন্য বিনিয়োগ বেশী লাভজনক।'' বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন -

''সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হল নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ।''

অপর দিকে ফায়লা রাঃ নাম্নী এক মহিলা সাহাবী নবী (সাঃ)কে বললেন,-

"انى امرأة ابيع واشترى"

''আমি একজন মহিলা। আমি নানা রকম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি।''[১৭]

এরপর সে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী সাঃ এর কাছ থেকে জেনে নিত।

ইসলাম যে নারীদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে আসলে অনুমতি দিয়েছে তা অন্য একটি ঘটনা থেকে বুঝা যাবে। হযরত উমর রাঃ এর খিলাফত যুগের একটি ঘটনা আসমা বিনতে মাখামা রাঃ তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নারীদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য সংযুক্ত থাকার জন্য আর্থিক লেনদেন গত বিদ্যা থাকতে হবে। সেজন্য তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে।

১৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শিক্ষা ঃ

বিশ্বের ৫০% খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করে মহিলারা। তাই বেশী বেশী খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশ্বব্যাংক তাই পরামর্শ দিয়েছে যে, ''অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহন সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও তরান্বিত হবে।'' ILO এর ১৯৯৪ এর হিসাব মতে বিশ্বে ৮৯৭ মিলিয়ন মহিলা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করেছে।

১৫। শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি তার নিজের স্বামীর এবং সন্তানের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি নবী সাঃ এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন-

Dhaka University Institutional Repository

আমি কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করে বিক্রি করি। আমার স্বামী ও সন্তানদের (আয়ের অন্য কোন উৎস নেই। তিনি জানতে চাইলেন তিনি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন? নবী সাঃ বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এজন্য তুমি পুরস্কার লাভ করবে।

তাহলে উপরোক্ত ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে ইসলাম নারীকে আর্থিক সচ্ছলতা পাওয়ার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষন মূলক কাজ করতে নিষেধ করে না। বরং এভাবে আয় করে সংসারের কাজে তা খরচ করলে তার জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষনা করা হয়েছে। তাই কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য নারীদের প্রশিক্ষন মূলক শিক্ষা দিতে হবে।

১৬। অধিকার সংরক্ষনের জন্য ঃ

ইসলামী সমাজ নারীকে যে সব অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দান করেছে এবং যেখানেই যে তার অধিকার নস্যাত হতে দেখেছে অথবা তার প্রতি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা নির্যাতন হয়েছে সেখানেই সে তার এসব অধিকার সংরক্ষনের জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা সাধনা করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামী আইন তাকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে কানিয়াব করেছে। নিম্নের একটি ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

এক ব্যক্তি একজন সম্পদশালী লোকের সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দেয় কিন্তু মেয়ে তাকে পছন্দ করছিল না। সে নবী (সঃ) কে বললো ''আমার পিতা তার এক সম্পদশালী ভাতিজার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য লাভ করতে পারেন।''

নবী করীম সাঃ মেয়েটিকে বললেন, যদি তুমি এ বিয়ে পছন্দ না করো তা হলে এ ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে বিয়ে ভেংগে ফেলতে পার আবার টিকিয়ে রাখতেও পার।

''আমি এ বিয়ে মেনে নিলাম। তবে আমি চেয়েছিলাম নারী সমাজ জানুক, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের পিতাদের নেই''। ''এখন বাপের জুলুমের বিরুদ্ধে একজন নারীর সফল প্রতিবাদ।''

তাহলে উপরোক্ত ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে, ইসলাম নারীদেরকে যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে সেসমস্ত বিষয়ে তাদেরকে জানতে হবে। উক্ত মেয়েটি যদি বুদ্ধিমতি না হত তাহলে নবী করীম সঃ এর কাছে প্রশ্ন করার সাহস পেত না। ফলে সারা জীবন নিজের জীবনটা বিষিয়ে বিষিয়ে সংসার করত।

তাই নারীদেরকে অধিকার সচেতন তথা অধিকার সংরক্ষন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নতির ও অগ্রগতি সাধনের জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনেক অনেক বেশী। এটা অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ

১। কাজী নজরুল ইসলাম সঞ্চিতা ''নারী কবিতা'' পৃষ্ঠা নং- ৬৩।

২। আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা'' পৃষ্ঠা নং-১৭।

৩। ইবনে মাজা - কিতাবুল ইলম অধ্যায়।

৪। ''উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষার'' পৃষ্ঠা নং-১০০, ১০১, ও সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী ইসলামী সমাজে ''নারী'' পৃষ্ঠা নং-৯৮-১০০,১১৯-১৪৪।

৫। সীরাত ইবনে হিশাম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৯,৩০ এবং তাবকাতে ইবনে সাদ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৩০১।

৬। তাবকাতে ইবনে সাদ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৩১১।

৭। মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ গাযওয়াতুন নিসা মা আর রিজাল।

৮। আল বায়ান ওয়াত তাবাইয়ূন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭০।

৯। মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৫০ ও ৬০।

১০। বুখারী কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ রাদ্দুন নিসায়েল জারহা ওয়াল কাতলা।

১১। মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়র, অনুচ্ছেদ ঃ আন নিসাউল যাসিরাত ----। মসনদে আহমদ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮৪। বর্ণনার ভাষা মুসলিমের।

১২। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৮৬।

১৩। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০।

১৪। মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫১।

১৫। বুখারী কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল আহযাব, অনুচ্ছেদ কাওলুহুলা তাদখূলূ বুয়ুতান নারীয়ে।

১৬। বুখারী কিতাবুল জুমআ, অনুচ্ছেদ ঃ কাওলুল্লাহ তায়ালা, ফইয়া কুদিয়াতিস মালাতু।

১৭। তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-

''যুগে যুগে নারী শিক্ষার রূপরেখা''

		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ নং ১।	ইসলাম পূর্বযুগে নারী শিক্ষা।	৫৬-৭৭
২।	ইসলাম পরবর্তীযুগে নারী শিক্ষা।	৭৮-৮৭
৩।	মহিলা সাহাবীদের সময়ে নারী শিক্ষা।	৮৮-১০০
৪।	নারী শিক্ষায় হযরত আয়েশা রাঃ এর অবদান।	১০১-১২১
৫।	খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারী শিক্ষা।	১২২-১২৬
৬।	উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষা।	১২৭
৭।	আববাসীয় যুগে নারী শিক্ষা।	১২৮
৮।	মোগল আমলে নারী শিক্ষা।	১২৯-১৩৫
৯।	মধ্যযুগে বাংলায় নারী শিক্ষা।	১৩৬
১০।	আধুনিক যুগে বাংলায় নারী শিক্ষা।	১৩৭-১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-

''যুগে যুগে নারী শিক্ষার রুপরেখা''

অনুচ্ছেদ নং - ১

ইসলাম পূর্বযুগে নারী শিক্ষা ঃ

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব যুগে প্রাচীন মানব সমাজ গুলো এবং ইসলাম অভ্যুদয়ের পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা সহ নারী শিক্ষার রুপরেখা কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যুগের নারী শিক্ষা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। নারীর এই আইনগত সামাজিক অবস্থা যিনিই ন্যায় নিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করবেন, তার কাছে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নারীর প্রতি সদা অথবা নিষ্ঠুর আচরনে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলাম অভ্যুদয়ের পূর্বে নারী কখনও কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত শিক্ষার মর্যাদা লাভ করেনি।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষার বিষয়টা যেহেতু একটি সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত প্রেক্ষাপটের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু ইসলাম পূর্বযুগে নারী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে তৎকালীন সমাজে নারীদের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার কথা এসে যায়। সে সম্পর্কে কিছু বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।-

গ্রীসে নারী শিক্ষা ঃ

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গ্রীস সভ্যতাই সর্বাপ্রেক্ষা গৌরবময়। তাই প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতী সাধবী ছিল এবং গৃহের বাইরে বের হত না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ীর ভিতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। ফলে সাধারন সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃনিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হতো। গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররুপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন ''women is the greatest source of choose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which out wardly looks very beautiful but if sparrous eat it they die without fail.''

''নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যাহা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষন করলে ইহাদের মৃত্যু অনিবার্য।''[১]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারনা ব্যক্ত করতে যেয়ে, এন্ড্রারসকি বলেন,-

Cure is possible for fireburns and snake bite. but it is impossible to arrest womans charms.

''অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।''[২]

এছাড়া, গ্রীক পুরানে কল্পিত নারী ''পান্ডোরাকে, মানবের দুঃখ-দুর্দশার কারন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।''

যে রূপ হযরত হাওয়া (আঃ)কে ইহুদী পুরানে বিচারের জন্য দায়ী করা হয়েছে। হযরত হাওয়া আঃ সম্পর্কে কল্পিত মিথ্যা কাহিনী ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি নীতি, আইন-কানুন, সামাজিক ক্ষেত্রে, নৈতিক চরিত্র প্রকৃতিকেও যে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, তা কাহারও অজ্ঞাত নহে। পান্ডোরা সম্পর্কে গ্রীকগন যে ধারনা পোষন করতঃ তাহাও তাদের মানসিকতাকে সমভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাদের দৃষ্টিতে নারী একটি নিকৃষ্ট জীব ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোনই মর্যাদা ছিল না এবং সম্মানিত মর্যাদা একমাত্র পুরুষের জনাই সংরক্ষিত ছিল।

তাহলে উপরোক্ত দার্শনিক এবং গ্রীক পুরানের দৃষ্টিতে জানা যাচ্ছে নারীকে তারা মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিত না। আর সেখানে নারী শিক্ষার কথাতো কল্পনা করা যায় না।

শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচরন ছিল। তবে আইনগত ভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলতো। যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো,সেখানে তার কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারাজীবন তারা পুরুষের দাসীবাদীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি ভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরন করে নিতে হতো। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। সে সমাজের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের এক চেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেয়া হতো না। বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন কোন নারী যখন তালাক চাইবার জন্য আদালতে যেত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওত পেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়া মাত্র পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

অবশ্য স্পার্টাবাসী কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। তাকে উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনাদেনের এখতিয়ার দিয়েছিল। তবে এটা তাদের পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল না। এর কারন ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সর্বক্ষন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো। তাই তারা তাদের অনুপস্থিতিকালে গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীদের উপর ন্যস্ত রাখতো। এ কারনে স্পার্টার মহিলারা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের চেয়ে বেশী রাস্তায় বের হতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। তথাপি এরিষ্টটল নারীকে এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীর নিন্দা করতেন এবং এই অধিকার প্রদানকেই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী করতেন।

অতঃপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করলো। তখন নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভাসমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগল। তবে গ্রীক সভ্যতা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন এবং সভাসমিতিতে উপস্থিত করলেও নারী শিক্ষায় তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। বরং নির্লজ্জতা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দূষনীয় মনে হতো না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্ম নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী আফ্রোদাইতি এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারন মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহন করে এবং তার ঔরস থেকে সে কিওপিড নামক যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শন স্বরুপ হারমোডিস ও আরামতোজন নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রীক সভ্যতার নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আর কিছু কিছু মহিলা শিক্ষার আলো পেলেও তাদের সে শিক্ষা সমাজের কোন কাজে আসেনি।

রোমান সমাজে নারী শিক্ষা ঃ

গ্রীক জাতির পরে রোমক উন্নতির সুযোগ এসেছিল। রোমান সমাজেও নারী শিক্ষার কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। এখানেও পূর্বের ন্যায় উত্থান পতনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। রোমকগন যখন বর্বরতার অন্ধকার হতে বের হয়ে ইতিহাসের উজ্জল দৃশ্যপটে উদিত হয়, তখন তাদের সামাজিক শৃংখলার চিত্র এরুপ দেখা যায় যে, পুরুষ তার পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা হয়েছে; স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর তার পূর্ণ প্রভুত্ব রয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে হত্যা করতেও ক্ষমতাবান হয়েছে।

বর্বরতা যখন কিয়ৎ পরিমানে হ্রাস পেল এবং তাহযীব তমুদ্দুনের ক্ষেত্রে রোমকগন অগ্রসর হতে লাগল, তখন প্রাচীন পারিবারিক রীতিনীতি বজায় থাকলেও তার কঠোরতার লাঘব এবং অবস্থা কিঞ্চিত পরিমিত হল। রোমান সাধারনতন্ত্রের উন্নতিকালে গ্রীকদের ন্যায় পর্দা-প্রথার প্রচলন হয় নাই, কিন্তু নারী ও যুবক-যুবতীগনকে পারিবারিক শৃংখলায় সন্ত্রমশীল করে রাখা হয়েছিল। সতীত্ব, সাধুতা বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এক অমূল্য রত্ন ছিল এবং ইহাই ছিল সম্ভ্রমশীলতার কষ্টিপাথর। নৈতিক কষ্টিপাথর ও ছিল উচ্চমানের। তা একটি ঘটনা থেকে বুঝা যায়, একবার রোমান সিনেটের জনৈক সদস্য আপন কন্যার সম্মুখে তার স্ত্রীকে চুম্বন করেছিল। ইহা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের প্রতি কঠোর অবমাননা করা হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং সিনেট গৃহে তার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনাসূচক ভোট প্রদত্ত হয়। তৎকালে একমাত্র বিবাহ প্রথাই ছিল স্ত্রী-পুরুষের মিলনের বৈধ ও সম্মানিত পন্থা। নারীর সম্মান নির্ভর করত তার মাতৃত্বে। বৈশ্যা

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেনী যদিও বিদ্যমান ছিল এবং একটি সীমারেখা পর্যন্ত তাদের সংগে মেলামেশার অধিকারও পুরুষদের ছিল তথাপি রোমদেশীয় জনসাধারন ইহাকে অত্যন্ত হেয় মনে করত এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখা হত। তাহযীব-তমদ্দুনের উন্নতির সংগে সংগে নারীদের সম্পর্কে রোমকদের দৃষ্টিভংগীরও পরিবর্তন হতে লাগল। ক্রমশ বিবাহ-তালাকে বিধি ব্যবস্থার এবং পারিবারিক রীতিনীতিরও এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে, অবস্থা অতীত অবস্থার বিপরীত হয়ে গেল। বিবাহ শুধু একটা আইনগত চুক্তিনামায় (Civil contract) পরিণত হয়-যার স্থায়ী ও বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর উপর নির্ভর করত। দাম্পত্য সম্পর্ক দায়িত্ব গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। নারীকে উত্তরাধিকার ও ধনসম্পদ, মালিকানার পূর্ন অধিকার দেয়া হল। রোমান আইন তাকে পিতা ও স্বামীর কর্তৃত্ব হতে স্বাধীন করে দিল। রোমান নারীগন সামাজিক ক্ষেত্রেই শুধু স্বাধীনতা লাভ করল না। জাতীয় ধন-সম্পদের একটা বিরাট অংশও ক্রমশ তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ল। তারা স্বামীদিগকে উচ্চহারের সুদে টাকা কর্জ দিতে লাগল। ফলে স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হল। তালাক এত সহজ বস্তু হয়ে পড়ল যে, কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগল ''বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পন্ডিত সীকা (খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৬-খ্রীষ্টপূর্ব ৮) তালাকের আধিক্যের অনুপাত করে বলেন, আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নহে নারী তার স্বামীর সংখ্যার দ্বারাই নিজের বয়স গণনা করে।''[৩]

এই যুগে নারী পরস্পর বহু স্বামী গ্রহন করতে থাকে। মার্শাল (খ্রীঃ ৪৩-১০৪) একটি নারীর উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে দশজন স্বামী গ্রহন করেছিল। জুভেনিয়েল (খ্রীঃ ৬০-১৪০) একটি নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। সে পাচ বৎসরে আটজন স্বামী গ্রহন করেছে। সেন্ট জুরুন (খ্রীঃ ৩৪০-৪২০) এমন এক নারীর বর্ণনা করেছেন যে,তার জীবনে বত্রিশ জন স্বামী গ্রহন করেছে এবং সে তার শেষ স্বামীর এক বিংশ পত্নী ছিল।

বিবাহ ব্যতীত নারী পুরুষের যৌনমিলন যে দূষনীয়। এমন ধারনাও এ যুগে মানুষের মন হতে দূরীভূত হতে লাগল। বড় বড় নীতিবিদগণও ব্যভিচারকে একটি সাধারন কার্য মনে করত। খ্রী পূর্ব ১৮৪ সনে (cato) রোমে নীতিপরিদর্শক ও নীতিতত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনিও যৌনসুলভ লাম্পট্যকে সংগত বলেছেন।

সিসেরো নব্য যুবতীদের জন্য নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করার পরামর্শ দিয়েছেন। জিতেন্দ্রিয়তা নিস্পৃহতা উদাসিনা, তিতিক্ষা, নিঃসংগতা প্রভৃতি দার্শনিক মূলনীতির Stoics পূর্ণ অনুসারী Epictetus তার শিষ্য মন্ডলীকে নিম্নরুপ উপদেশ দান করতেন।

যতদূর সম্ভব বিবাহের পূর্বে নারীদের সংস্পর্শ হতে বিরত থাকবে। কিন্তু যদি কেহ এ বিষয়ে সংযমী হতে না পারে, তাকে ভর্ৎসনা করিও না।

অবশেষে নৈতিক চরিত্র ও সামাজিকতার বন্ধন এত শিথিল হয়ে পড়ল যে, কামপ্রবণতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোম সাম্রাজ্য নিমজ্জিত হয়ে গেল। রংগালয়ে নির্লজ্জতা ও নগ্নতার অভিনয় শুরু হল। নগ্ন কামোদ্দীপক ও অশ্লীল চিত্র দ্বারা গৃহের শোভা বর্ধন আবশ্যক বোধ করা হল। বেশ্যাবৃত্তি এত প্রসার লাভ করল যে, রোম সম্রাট টাইবেরিসের (খ্রীঃ১৪-৩৭) শাসনকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদিগকে বেশ্যা

Dhaka University Institutional Repository

নর্তকীর কার্য হতে নিরস্ত করার জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ফ্লোরা নামে একটি ক্রীড়া সেইকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ এতে উলংগ নারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা হত। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একত্রে স্নানাবগাহন প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমীয় সাহিত্যে অশ্লীল নগ্ন চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধাদি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করা হত এবং এরূপ সাহিত্যই আপামর সাধারনের সুখপাঠ্য ও সমাদৃত ছিল। সাহিত্যের মান এত নিম্নস্তরের ছিল যে, এই সমস্ত আশ্রাব্য কুশ্রাব্য প্রবন্ধ রচনার রূপাত্মক এবং শ্লেষাত্মক বাক্য যোজনারও আবশ্যক অনুভূত হত না। রোমান সমাজে নারীদের শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি। যার জন্য শিক্ষার কোন ফল সমাজে পরিলক্ষিত হয়নি।

পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত হবার পর রোম সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অট্টালিকা এমনভাবে ধুলিসাৎ হয়ে পড়ল যে, তার শেষ ইষ্টকটিরও অস্তিত্ব রইল না।

ভারতীয় সভ্যতায় নারী শিক্ষা ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি তথা নারী শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীন রাখাই ছিল আসল রীতি। মনুর মতে, তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারন, নারী জন্মগত ভাবে দুশ্চরিত্র ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

নারী সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারনাই সাধারনভাবে প্রচলিত ছিল। তাহলে উক্ত ধারনা থেকে বুঝা যাচ্ছে নারীর যেখানে সামাজিক মর্যাদা ছিল না, সেখানে শিক্ষার অধিকারের কথা তো চিন্তা করা যায় না। উচ্চ শ্রেনী ও রাজবংশের মহিলাদিগকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের কাছ হতে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাগনের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হত। কোন কারনেই তাদের গৃহের বাইরে যাওয়ারও অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারনে উচ্চ বংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এই কার্যে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, তজন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্র শিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হত, যেন সহজে যে কোন লোকের চোখে পতিত না হয়। একটি আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহন করত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমন্ডলের দিকে তাকাতো অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলতো, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।[৫]

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেনীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা-প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ন পর্দা প্রথা ইসলামের আর্বিভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারনভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জলিত চিতায় আত্মা বিসর্জন দিতে হত। এখনও এই বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। যদিও এই প্রথা উইলিয়াম বেন্টিক রহিত করে গেছেন। হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রানী

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ। এজন্য ই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্ম বিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

ভারতীয় ধারনায় নারী হচ্ছে-

There is no creature more sinful than woman, woman is burning fire, she is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

অর্থাৎ ''নারীর ন্যায় এত পাপ-পংকিলতাময় প্রানী আর নাই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরুপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।''[৬]

তাই Men should not love them.

''নারী দিগকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নহে,,।[৭]

পুত্র সন্তান জন্ম নিলে পরিবারে আনন্দ ধরতো না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসত।

পিতামাতা এই বলে প্রার্থনা করত-

The birth of a girl grant if else-where here grant a boy.

''হে দেবতা নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।''[৮]

এখানে হিন্দু সমাজের নারীদের সম্পর্কে অন্তরের আশা-আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাহলে এ থেকে অনুনেয় যে, নারী কতটা খেলনার পাত্র ছিল।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয় স্বরুপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সে যুগে বালিকাদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেয়া হত। দেবতাগন তাহাদিগকে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারত। এই বালিকাগন অবশেষে মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের উপরি পাওয়া রুপে পরিগনিত হত।

বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোর পূর্বক নারীদিগকে অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাদিগকে নিজেদের মধ্যে বিতরন করে নিত। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসী রুপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিনী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। ব্যভিচার পতিতাবৃত্তি কিংবা কোন অপরাধের কারনে এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভংগ করা যেতনা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃনা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।

তাই বলা যায় ভারতীয় সভ্যতায় নারী শিক্ষার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

চীন সভ্যতায় ঃ

দুনিয়াতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম-গ্রন্থে নারীকে ''waters of woe'' (দুঃখের প্রস্রবন) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কখনও কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমন কি তার সন্তানদিগের উপর তার কোন অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা তখনই তাকে তালাক দিতে পারত। এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রয়ও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবনযাপন করতে হত এবং পুর্নবিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন, ''মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রানী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই।''

সে দেশে বালকেরা দরজার সম্মুখে এমনভাবে দাড়াত যেন তারা স্বর্গ হতে আগত দেবতা। স্ত্রী, কন্যা প্রসব করেছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর পতিত না হয় তজ্জন্য সে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লুকায়িত থাকত। সে মৃত্যুবরন করলে কেহই তার জন্য রোদন করত না।

''ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তা মাতাপিতা তাকে গ্রহন করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেয়া হত।''[৯]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিবাহের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস-পত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সংগে আনত, **এমন সবই** স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগনিত হত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকিয়ে থাকতে পারত। পুত্র-সন্তান প্রসব ও স্বামীর মুরব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হয়ে উঠত।

''বর ও কনের পরিবার প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হত। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের উকিলের মাধ্যমে এই কার্য সম্পন্ন হত।''[১০]

মূলকথা চীন সভ্যতায়ও নারীরা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। সে হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা ছিল চির বঞ্চিত ও অবহেলিত।

বৌদ্ধ ধর্মে ঃ

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হল নারীর সাহচর্যে নির্বান লাভ করা চলে না। যা ছিল ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা হল নারীর সহযোগিতায় আল্লাহকে পাওয়া যায়। ইহা হতেই বৌদ্ধ ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বিবাহ ও ইহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্য-কলাপ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। ইহার লক্ষ্য হল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মতে, নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। ইহার বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, Women are of all the snares which the tempter has spread of men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

অর্থাৎ ''মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।''[১১]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারনা ব্যক্ত করতে যেয়ে বেটনী (Bettany) তার Worlds Religions গ্রন্থে বলেন-

Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of women, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নহে। নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।

ইয়াহুদী ধর্মে নারী শিক্ষা ঃ

ইয়াহুদী ধর্ম মতে, ''নারীর উপর সৃষ্টি কর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এ সমাজে নারী শিক্ষার কোন উন্নতির সাধিত হয়নি। এই ধর্ম মতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইয়াহুদী সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল বলে গণ্য করা হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগনিত হত।''[১২]

ইয়াহুদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট এমন কি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গন্য হত। ভ্রাতা থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তারাধিকারী হতে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী।

''সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহুনারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগনিত ছিল না।''[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইয়াহুদী নারী ঃ

''ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশী ছিল।''[১৪]

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত। বিবিধ প্রকারের বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলির বিচ্ছেদ হতে পারত।[১৫]

বিবাহের পূর্বে কৌমার্য ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা সাধুতা ছিল বিবাহের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিল এবং বিবাহের সময় সতীত্ব প্রমান করতে না পারলে বালিকাদিগকে প্রস্তারাঘাতে মেরে ফেলা হত।[১৬]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষনের সময় সাহায্য চেয়ে চীৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষনকারীর সাথে বিবাহই ছিল ইহার বিধান।[১৭]

উপরোক্ত নারীদের প্রতি এমন অধিকার থেকে বুঝতেই পারা যাচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা কতটুকু অগ্রসরছিল।

মাতা পিতা কন্যাদিগকে বিবাহে বাধ্য করত না। কিন্তু তাহাদিগকে বিবাহ দেয়া বা কারও নিকট বিক্রয় করে ফেলার আইন সঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[১৭]

বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিত দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধা বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এই সব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গন্য হত না।[১৮]

স্বামী বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করত। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে নারীরা ইহুদী সমাজে কত নির্যাতন মূলক জীবন নির্বাহ করত। আর সেখানে শিক্ষার অধিকার তো ছিল কল্পনাতীত।[১৯]

খ্রীষ্ট ধর্মে নারী শিক্ষা ঃ

অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার ন্যায় খ্রীষ্ট ধর্মেও নারী শিক্ষার কোন কদর করা হয় নাই। খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর ও নিদারুন নৃশংস আচরন করা হয়েছে। উল্লেখ্য পোপ শাসিত, পবিত্র, রোম সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তৈল ঢেলে দেয়া হয়েছে, দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তা'দিগকে বেধে হেচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেধে রেখে তা'দিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতেও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ এর

Dhaka University Institutional Repository

এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Women has no soul নারীর কোন আত্মা নাই।

ডঃ এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তার গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন-

১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এক রিপোর্ট মতে, বলা যায় এই আইনের বলে খ্রীষ্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। এভাবে খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।

নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারনরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে পরিকার ভাবে বর্ণিত আছে, ''নারীর পাপের দরুনই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।''[২০]

I will greatly multiphy your pain in child bearing in pain you shall bring forth children; yet your desire shall be for your hasband and be shall rule over you.

''গর্ভধারনে তোমাদের ব্যথা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব। এই ব্যথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করবে। তথাপি তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করবে এবং সে তোমাদের উপর শাসন করবে।''[২১]

''ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারী জাতির উপর দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন- নারী বলিয়াই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিত।''[২২]

এরুপে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীষ্টান জগত নারী জাতির হীনতা ও অনর্যাদা প্রচার করে। ''খ্রীষ্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন, যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।''[২৩]

''কিন্তু খ্রীষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রীষ্টধর্মের রচয়িতা সেন্টপল বিবাহকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর ইহাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।''[২৪] বরং তিনি Necessary evil (জরুরী পাপ) হিসাবেই বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন-

It is well for a man not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries she dose not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the

Dhaka University Institutional Repository

affairs of the lord, how to please the lord, but the married man is anxious about wordly affairs, how to please his wife. I say this for your own benefit not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the lord.

''কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল, সে যেমন আছে, তদ্রূপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিবাহ করতে চেও না। কিন্তু তুমি বিবাহ করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিবাহ করলে সেও পাপ করেনা। তবে যারা বিবাহ করে তারা পার্থিব দুঃখ কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, ইহাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাছে উদ্বিগ্ন, কি রূপে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কি রূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্টি করা হবে। আমি তোমার নিজ কল্যানের জনাই এই উপদেশ দিতেছি তোমার উপর কোন বাধাঁ আরোপের জন্য নহে। বরং শৃংখলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি ইহা বলতেছি।''[২৫]

He that giveth her not in marrige doeth better.

''যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না। সেই উত্তম কাজ করে।''[২৬]

তালাক ও পুণর্বিবাহ ঃ

খ্রীষ্টান ধর্মের বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতিই নাই।

- - that the wife should not separate from her hushand and that the husband should not divorce his wife.

স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।

মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃনা এভাবে প্রকাশ করেন।—

Who ever divorces his wife and marries another, commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she co-mmits adultery.

অর্থাৎ ''যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রীকে গ্রহন করে সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহন করে সে ব্যভিচার করে।''[২৭]

''কিন্তু মতান্তরে খ্রীষ্টান ধর্মে তালাক ও পুণর্বিবাহ অবৈধ নহে।''[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

গৃহের অভ্যন্তরে ও সমাজে স্ত্রীর স্থান ঃ

খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে নারী পাপের উৎস। এই ধারনাই তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে তাই যে নারী তাদের কাছে সমস্ত পাপের উৎস ছিল। সেই নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা কিভাবে সম্ভব? এটা ছিল তাদের কাছে একেবারে অর্থহীন। নারী জীবনের পরম অবদান হইল পরিবারের প্রতি দরদ ও সর্তক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হয়ে থাকা ও নিজকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেয়াই ছিল তার পরম সাফল্য।

তাদের ধর্মে বলা হয়েছে -

''প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হলেন যিশু, নারীর অধিকর্তা তার স্বামী।''[২৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টান ধর্মে নারী সমাজ হতে বহির্ভূত ছিল এবং তাকে একান্ত ভাবেই স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হত।

খৃষ্টান ধর্মে নারীদের শিক্ষা প্রসংগে বলা হয়েছে-

Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have autority over man; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and become a trangrssor.

অর্থাৎ "পূর্ন আনুগতের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করবার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেই নাই; সে নির্বাক থাকবে। কারন, সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন, তৎপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হন নাই; বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভংগ করেছিলেন।''[৩০]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামে আছে হাওয়া আদম আঃকে প্রতারিত করেন নাই বরং আদম আঃ শয়তানের প্ররোচনায় স্বীকারে পরিনত হয়েছেন। আর নারী কর্তৃক পুরুষকে শিক্ষা দান কত নিম্ন চোখে দেখা হয়েছে।অথচ ইসলামে নারী পুরুষকে একে অপরের সহযোগী মনে করা হয়েছে। পর্দা প্রসংগে খ্রীষ্টান ধর্মে বলা হয়েছে,

নির্জনে থেকে নারী সূতা কাটবে। বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারনে তাঁদিগকে বের হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man; Neither was man ereated for woman but woman for man. That is why a woman ought to have a veil.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ''নারী পর্দা পরিধান করবে। যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নহে। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারন পুরুষ নারী হতে সৃষ্ট হয় নাই; বরং নারী পুরুষ হতেই সৃষ্ট হয়েছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এ জন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করতে হবে।''[৩১]

সেন্টপলের শিক্ষা নারীদিগকে ধর্মানুষ্ঠান হতে বহির্গত করেছে এবং এ জন্যই গীর্জায় গমন তাদের উচিত নহে। সেন্টপল নারীদিগকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারনা করতেন। এ জন্যই তিনি তাহাদিগকে ধর্ম-প্রচার ও ধর্ম-বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন নাই।

তার মতে,

The woman should keep silince in the churches, For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, If there is anything they desire to know, let them ask their hasbands at home, For it is shameful for a woman to speak in church.

অর্থাৎ ''নারীরা গীর্জায় নীরব থাকবে। কারন, তাহাদিগকে কথা বলবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই; কারা অধীন হয়ে থাকবে, ইহাই আইনেরও নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়ীতে তাদের স্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করে নিবে। কারন গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।''[৩২]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাব্যস্ত হয় নারীর আত্মা নাই Woman has no soul এবং দোযখ হল তার বাসস্থান। ইহার ব্যতিক্রম হল কেবল হযরত ঈসা আঃ এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)।

''নারী মানুষ কিনা,, এই বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে। তবে পুরুষের কল্যান ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর ন্যায় রাখত এবং স্বামীকে প্রভূ বা ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে হত।

অতএব মনু নারী সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, খ্রীষ্ট ধর্মেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। বরং উভয় জাতি একই ধারনা পোষন করছে।

পারসিক ধর্মে নারী শিক্ষা ঃ

পারসিক ধর্মেও অন্যান্য সভ্যতা ও ধর্মের মত নারী শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

কথিত আছে, ইরানের অগ্নিপুজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরোয়েষ্টি। তার বক্তব্য এবং ধর্ম নীতিতে ও নারীদের ব্যাপারে লজ্জাকর ও ঘৃণিত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। হযরত ঈসা আঃ জন্মের প্রায় পচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরোয়েষ্টির যুগ। তার মাজুসি ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যৌন কেলেংকারী। সে কারনেই কায়খসরু, গষ্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী রাজারাও এই ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিল। যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারনায় এ ধর্ম দূরদুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট পারভেজও মজুসী ছিল। যে একই সাথে বার হাজার নারীর পতিও বটে। এ বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে শতাধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোন প্রমুখ নিকটাত্মীয় স্বজন। পারভেজ এবার হাজার স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিল না। বরং যখন ইচ্ছা বিশ পঞ্চাশজনকে তালাক দিতো বা হত্যা করতো আবার পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো। এমনকি সে তার বিবিদের কে বিক্রি করতে অথবা অন্য কারো অংশিদারিতা করতে কোন রুপ দ্বিধাবোধ করতো না। সে সময় নারী জাতি পন্যদ্রব্য হিসেবে সাধারন ভাবেই বেচাকেনা হতো। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সহবাস করার মত নির্লজ্জ কর্মকান্ডেও তারা জড়িত ছিল। এভাবে মা, বোন, মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহুদূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিল। এ ধর্মের অন্যতম সংস্কারক দার্শনিক মযুক এসে ঘোষনা দিলেন, ধন ও ধনী সকল অন্যায়ের উৎস। তাই সে ধন ও নারীকে ব্যক্তি অধীনে না রেখে সর্বসাধারনের সম্পত্তিতে পরিনত করলো। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত জনতার ভোগের পাত্রে পরিনত হলো।

মজুসী ধর্মে পালা ক্রমে নারী নির্যাতনের শেষ নেই। যুবতী নারী সম্পর্কে বলা আছে। কোন পুষ্পবতী যেন সূর্য না দেখে। কোন পুরুষের সংগে কথোপকথন না করে। আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরন না করে। অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সংগে একত্রে শয়ন না করে। খাদ্য স্পর্শ না করে কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবতী নারী এর ব্যতিক্রম করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।

ইউরোপে নারী শিক্ষা ঃ

''বর্তমান ইউরোপ নারী ও পুরুষের সাম্যের বড় দাবীদার। কিন্তু এই ইউরোপ এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও নারী পুরুষের জুলুম অত্যাচারের শিকার ছিল। এমন কোন শক্তিশালী আইন ছিল না যা পুরুষের বাড়াবাড়িতে প্রতিরোধ করতে পারতো।''[৩৩]

ইংল্যান্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। কিন্তু বিয়ের পরে নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে উঠেছিল যে, নারীর জিম্মায় বিয়ের পূর্বের কোন ঋন থাকলে পুরুষ তা পরিশোধ করবে। কিন্তু তার কোন ধন সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি থাকলে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে নারী তার সম্পদের ব্যাপারে কোন চুক্তি বা বুঝা পড়া করে নিলে তা ভিন্ন কথা। তরন পোষনের ব্যাপারেও কোন উপযুক্ত আইন ছিল না। পুরুষ ইচ্ছা করলে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতো। পক্ষান্তরে তাকে স্ত্রীর সম্পদের বৈধ হকদার মনে করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কাজ করার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। সে তার নিজের ইচ্ছামত কোন চুক্তি করতে পারতোনা। এমন কি অর্থোপার্জন করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না। মেয়েদের পিতামাতার মালিকানা মনে করা হতো। পিতামাতা যার সাথে ইচ্ছা তাদের বিয়ে দিতো। বিয়ে ছিল একটি ব্যবসায় যার মাধ্যমে পিতামাতা মেয়েদেরকে ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিতো। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা মিল (Mill) তার, পরাধীন নারী গ্রন্থে লিখেছেন-

''ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন খুববেশী দিন অতিবাহিত হয়নি যখন বাপ তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতো। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করা হতো না।''[৩৪]

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসারের পূর্বে পুরুষ ছিল সর্বকিছুর একমাত্র মালিক। নারীর তুলনায় পুরুষের অপরাধের জন্য কোন শাস্তি বা আইন কিছুই ছিল না। কিন্তু কোন অবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার ছিল না। ইংল্যান্ডের প্রাচীন আইনে পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। তবে কার্যত সে ছিল তার বাদশাহ। এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করার পদক্ষেপকে আইনের পরিভাষায় ছোটখাট বিদ্রোহ বলে হালকা ভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু নারী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হলে তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল যা বিদ্রোহের শাস্তি অপেক্ষাও কঠোর। বর্তমান সময়েও ইংরেজ আইনের অনেকগুলো দিক এমন আছে যাতে মনে হবে নারী হচ্ছে পুরুষের খরিদ করা দাসী। এখনও গীর্জায় বিয়ের সময় সারা জীবন স্বামীর আনুগত্য করার জন্য নারীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় এবং সারা জীবন এ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সে আইনগত ভাবে বাধ্য থাকে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিছু করতে পারে না বা করলেও কোন সম্পদ গচ্ছিত করতে পারবেনা। যদি করে তাহলে আপনা হতেই তা স্বামীর সম্পদ বলে গন্য হয়। এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের আইন নারীর এতটুকু মর্যাদাও স্বীকার করতো না, যা অন্য সব দেশে দাসেরাও ভোগ করতো। এরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

হিন্দু মতে নারী শিক্ষা ঃ

হিন্দু ধর্মেও নারীর অধিকার ও মর্যাদার দিকে কখনও দৃষ্টি দেয়া হয়নি। সতীদাহের মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সতীদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর এই প্রথা বিলোপ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের তা মনোপুত ছিল না। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্য বলি দেয়া হতো।

উল্লেখ্য যে, ''ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।''[৩৫]

''কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু,নরক ও ঝড় বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।''[৩৬]

প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই মত পোষন করতো যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সনাতন ধর্মে একই সময়ে দশ দশটা স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পান্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিল। হিন্দুরা তালাক শব্দের সাথে পরিচিত নয়। নারীরাতো কথাই নেই, পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর অধিকার খর্ব হয়েছে বহুলাংশে। কারন কোন মেয়ে পুরুষের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে, তথাপি তাকে নিয়ে বাধ্য হয়ে ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভাল হোক বা না হোক স্ত্রী হিসাবে সেখানে তাকে থাকতেই হবে। সে ক্ষেত্রে পুরুষটি স্ত্রীকে অবাধ ভাবে যন্ত্রনা দেয়ার সুযোগ লাভ করে এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এই নির্যাতন সয়ে আসতেই হচ্ছে হিন্দু সমাজে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর কপাল ভাল কিন্তু স্বামী অসৎ হলে তার যুলুম নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার মত কোন পথ বা অবস্থান হিন্দু ধর্মে নেই। বরং স্বামীকে আরও উপদেশ দেয়া আছে যে, নারীকে দিবা-রাত্রি কখনও স্বাধীন হতে দেবে না, পরাধীনতাই তার মূল প্রাপ্য। হিন্দু ধর্মে আরও বলা হয়েছে নারী জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের অঙ্গশায়িনী হতে পারবে না, অর্থাৎ জীবনে বিবাহের রুপসাধ ও ভোগ করার সুযোগ পাবে না।

আরও বলা আছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলংকারাসক্তি, পাপলিপ্সা, আত্মগর্ব, ক্রোধ, একগুয়েমী ও বিরক্তিকরন নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গর্হিত কাজ করা তাদের স্বভাব। মিথ্যা বলা তাদের অভ্যাস। নারীর সংগে কখনও পরামর্শ করতে নেই। এমনকি পরামর্শ স্থলে উপস্থিত রাখতে নেই। পুরুষেরা অপকর্মের ফলস্বরুপ পরজন্মে নারীত্ব লাভ করে। সনাতন ধর্মে লেখা আছে '' অদৃষ্ট নরক, বন্যা ও বিষধর সর্প এর কোনটিই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।'' হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা এ ধরনের গুনাহ ও যুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং এর প্রতি নিন্দার ঝড় তুলেছে। হিন্দু সমাজে নারীকে যে কি চোখেদেখা হত তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ''১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত'' সমাজে নারীর স্থান,, শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার খ্যাত নামা শিক্ষিতা একজন হিন্দুনারী লিখেছেন, হিন্দু গ্রন্থগুলোতে কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা ভাবতে অবাক লাগে। আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে ''যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনা বিশিষ্ট ব্যক্তি পৃথিবীর সব সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে কেবল নারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না।'' লেখিকা আরও উল্লেখ করেন, তুলসী রামায়ানেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় আমাদের প্রতি বিশোদগার করা হয়েছে। তাতে আছে নারী জাতির অন্তরে সর্বদা ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যথা-ঔদ্ধত্য,মিথ্যা, চালাকী, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও নির্দয়তা। আবার তিনি লিখেছেন স্ত্রী ও শুদ্রকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জা ও গ্রহন করতে পারবে না। বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরন ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনে আমূল পরিবর্তন আনতে তারা বাধ্য হচ্ছে। অবশেষে তিনি লিখেছেন, সর্বত্র হিন্দুওয়ানী শিক্ষার জয় জয়কার। কিন্তু হিন্দু নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত নারী জাতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত না হবে। ততোদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতিমূর্তি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং তাদের মুক্তি ও শান্তি পথ অজ্ঞাতই থাকবে। তাহলে উপরোক্ত হিন্দুনারী লেখিকার ভাষ্য মতে বুঝা যাচ্ছে - হিন্দু ধর্মের নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল চিরবঞ্চিত। তাই বলা যায়, যে ধর্মে নারী

Dhaka University Institutional Repository

জাতিকে এত ঘৃন্য ভৎসনা করেছে, করেছে নির্দয় অবিচার, সে ধর্মের নারীরা শিক্ষার অধিকার কিভাবে পেতে পারে?

প্রাচীন জাতিসমূহের প্রবাদ বচনের আবর্তে নারী শিক্ষা ঃ [৩৭]

ইসলাম পুর্ব যুগে নারী সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রবাদ বাক্য অনুধাবন করলে তাদের চোখে নারীর প্রকৃত মর্যাদা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

নারী সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল-

একটি চীনা প্রবাদে আছে ঃ

''তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করোনা''

একটি রুশ প্রবাদে আছে,

''দশটি নারীর মধ্যেও একটির বেশী আত্মা থাকে না''

একটি স্পেনীয় প্রবাদে বলা হয়েছে-

দুষ্টা নারীকে এড়িয়ে চল। তবে বিদুষী নারীর প্রতিও ঝুঁকে পড়োনা।

একটি ইটালীয় প্রবাদে বলা হয়েছে ঃ

ঘোড়া চটপটে বা অলস যাই হোক, তাকে চালাতে চাবুক ব্যবহার কর। আর নারী সতীই হোক আর অসতীই হোক তাকে ভান্ডা দিয়ে ঠান্ডা কর।

তাহলে উপরোক্ত বিভিন্ন দেশীয় প্রবাদ থেকে নারী সম্পর্কে যে বিরুপ ধারনা দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নারী শিক্ষার উন্নতির কথা কিভাবে আশা করা যায়।

হামুরাবীর আইনে নারী শিক্ষা ঃ [৩৮]

হযরত ইব্রাহীম আঃ এর সমসাময়িক রাজা নমরুদ ধ্বংসের পর ইরাকের সবচেয়ে নামজাদারাজা ছিলেন হামুরাবী।

সেই হামুরাবীর আইনে নারীকে গৃহপালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হত। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরন হিসাবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক। সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নারী কন্যা হিসাবে কতটা মূল্যহীন ছিল আর সেখানে তার শিক্ষার তো কোন প্রশ্নই উঠেনা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক ইসলামী যুগে নারী শিক্ষা ঃ

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তাই তারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা মানব রূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাদের অবস্থান।

আল ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল সালায়ামী বলেন- ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয় সম্পর্কের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচ ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। সে এমন নিদারুন অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবদের ন্যায় নারীদিগকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতীত করত না।

আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জা জনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতো। কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ ও মনো কষ্টের কারন। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহংকার করতো। কিন্তু কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করতো। পবিত্র কুরআন তাদের এই অনুভূতি ও মনোবৃত্তির অতি সুন্দর চিত্র অংকন করেছে -

''তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহনের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ ধারন করে এবং মনোকষ্টে তার হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। লোক চক্ষু থেকে সে নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকে। কারণ এ দুঃসংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে তখন ভাবতে থাকে- লাঞ্ছনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবে, না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।'' (সুরা নাহল-৫৮-৫৯)

হযরত উমর রাঃ এ প্রসংগে বলেন-

''আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোন মর্যাদাই দিতাম না। তার পর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন। তাদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন এবং যা কিছু অংশ নির্ধারন করা দরকার ছিল তা করলেন।''

তাহলে হযরত উমর রাঃ এর উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে জাহিলী যুগে সতিকারে নারীকে কোন দিক থেকে মর্যাদা দেয়া হত না। ইসলাম এসে নারীকে সব দিক দিয়ে মর্যাদা দিয়েছে।

নবজাত কন্যা সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেহ কেহ গর্ত খনন করে উহাতে পুতে তাদিগকে হত্যা করত। কেহ কেহ খুব উচ্চ স্থান হতে নীচে নিক্ষেপ করত। আবার কেহ কেহ পানিতে ডুবে মারত বা কেটে ফেলত। এই সকল নির্যাতনের কারনে নারী মৃত্যুর নিকট আত্ম সর্ম্পন করত যেন, এরুপ মৃত্যুবরনের জন্যেই তার জন্ম হয়েছে। স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে আরবগন সমাজের ভয়ে ইহা

Dhaka University Institutional Repository

গোপন রাখত যেন ইহা জীবন পাপ অথবা স্থায়ী অমর্যাদার কারন ছিল। এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হত যেন তারা কসাইখানায় নীত হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশুছিল।

এমনি ভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল। যা সে নিজ খেয়াল খুশিমত ব্যবহার করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সঃ তার পয়গাম ও পবিত্র কুরআনের অমিয় বানী নিয়ে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর এরুপ অমানুষিক নির্যাতন চলতো। ইহার পূর্বে কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকে তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে সে আত্মীয় তাকে বিবাহ করত। আর সে সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবী করত।

কোন পুরুষ দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহনের ইচ্ছা করলে প্রথমা স্ত্রীরও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাত। ফলে তাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সে তার নিকট হতে নিস্তার লাভ করত। এই সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহনে ব্যবহার করত।

মদীনা শরীফে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তার বিধবা স্ত্রীর ও অধিকারী হত। বিধবা তার নিকট আমানত স্বরুপ গচ্ছিত থাকত এবং মুক্তিপন না দেয়া পর্যন্ত সে তাকে অন্য স্বামী গ্রহনে বাধা প্রদান করত।

সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তার একমাত্র কারন তারা শিক্ষার আলো থেকে ছিল বঞ্চিত। এজন্য তারা নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবর স্বরুপ বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারী দিগকে ধরে নিয়ে বিবাহ করত। এজন্যই আবর গণ কন্যা সন্তানের জন্মকে ভয় ও ঘৃনা করত এবং পুত্র সন্তানের জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ কারনেই আবরগণ কন্যাদিগকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।

This rovolting custom prevailed extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him.

অর্থাৎ ''হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুন ঘৃনা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল''[৩৯]

অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হত। সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের সাথে বিবাহ দিতে পারত, আর সে তার বিবাহ বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহন করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপন দিতে হত।

আরব নারীদের স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। বিবাহ এবং বহু পতি গ্রহনের প্রথাও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় কোন বিমাতা এমন কি তার বিধবা পুত্র বধূকেও

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ করতে পারত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত। বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করে দিয়েছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগনিত হত।

জগতের তৎকালীন সভ্যতার যেমন বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তদ্রূপ আরবেও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহন করতে পারবে সেটা সরকারী আইন, সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। বরং সামর্থ্য থাকলে যে যত খুশি বিবাহ করতে পারত।

তখকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্কে অবাধেই স্থাপিত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেনীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করত এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগন মনে করত।

উপরোক্ত ইসলাম পূর্ব যুগে নারী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল কোন দেশে, কোন সভ্যতায়, কোন ধর্মে এমনকি আরবেও যেখান থেকে নারীর সামাগ্রিক মর্যাদা রাসূলে করীম সাঃ এর মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল, দুঃখের সাথে বলতে হয় সেখানেও নারী ছিল সবচেয়ে নিষ্পেষিত নিগৃহীত একটি প্রাণী। যার প্রমান স্বরূপ আল কুরআনের ঘোষনা-

واذا الموؤدة سئلت - بأي ذنب قتلت...

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" ১৬ঃ৫৮-৫৯

অন্যত্র আল্লাহ রাসুল আলামীন কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করে বলেছেন-

ولا تقتلوا اولادكم من املاق - نحن نرزقكم واياهم

''দারিদ্র্যের কারনে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি।''৬ঃ১৫১

নারী যেখানে সমাজে বেচেঁ থাকার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত, সেখানে শিক্ষার অধিকার কতটুকু ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

তাই বলা যায় ইসলাম পূর্বে নারী কোন স্থান ও কোন সমাজ থেকে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা পাইনি। সে শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। আব্দুল খালেক 'নারী' পৃষ্ঠা নং-২

২। Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : The position of woman in Islam p.9-10, Islamic Book pablishers Kuwait 1982.

৩। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) 'পর্দা ও ইসলাম' পৃষ্ঠা নং-১৬

৪। Amer Ali, The spirit of Islam, p.30, Ramesh Chandra Mazumdar : Ideal and position of Indian women in dones tie life, Great women of India (ed) swamee and Mazaumdar, P.19.

৫। A.L. Bashon : The wonder that was india, Fontana 1971, p.181.

৬। Professor Jndra : Status of women is Mahabharat, p.16.

৭। Ibid, p.17.

৮। Ibid, p.21.

৯। Said Abdulllah Seif Al Hatimy : Ibid, p.7.

১০। Encyclopaedia Britanica vol. IV, p.409.

১১। Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, Ibid, p.12-13.

১২। Encyclopaedia Britanica, vol. p.732.

১৩। Shaner, Donald W : A christion view of pivorce, Leiden 1969, p.31.

১৪। Report of the commission marriage, Devaree and the church, London 1971, p.9-80.

১৫ ও ৮। Bible Deutero-nomy 22:21

১৬। Ibid, 22:23-25, 28, 29.

১৭। The Jewish Encychopaedia, vol. XII, p.556.

১৮। Pospishil victor : Divorce and marriage, London, p.38.

Dhaka University Institutional Repository

১৯। Lods, adolphe : Israel, London 1948, p.191.

২০। Bible : Genesis 3:16, New York 1973.

২১। Libra : womanhood and the Bible, New York p.18; Cleugh James ; Love locked out London 1963. p.265-265..

২২। Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : Ibid, p.4.

২৩। Pospishid, victor : Ibid, p.49.

২৪। Khansner, Yeseph : From Jesus to paul, London 1964, p.571-572.

২৫। Bible –I corinthiaus, 7 : 1,26,28,29,32,35.

২৬। Bible corinthians, VII-38

২৭। Biblem mark 10:11-12.

২৮। Pospislil, Victor : Ibid, P.38, corinthiaus 7:39-40.

২৯। Bible-I : corinthiaus, 11:3

৩০। Bible : Timothy, 2: 11-14.

৩১। Bible corinthiaus, 11:6-9..

৩২। Bible I : corinthiaus, 14:34-35.

৩৩। আহকামুল কুরআন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৪৮

৩৪। সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী ''ইসলামী সমাজে নারী'' পৃষ্ঠা নং-৩০

৩৫ ও ৩৬। মুসতফা আস সিবায়ি ''ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী'' পৃষ্ঠা নং- ১৩

৩৭ ও ৩৮। মুসতফা আস সিবায়ী ''ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী'' পৃষ্ঠা নং- ১৩

৩৯। O leary, delacy; Arabia Before Muhammad, london 1927, p.202.

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-২

ইসলাম পরবর্তী যুগে নারী শিক্ষা।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে, যখন সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে বিশ্বের সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে নারীর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন আরব উপদ্বীপের মরুময় পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মুখ দিয়ে সেই ঐশী বানী ঘোষিত হলো, যা নারীকে দিল সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ন সম্মানজনক অবস্থান,যা তাকে দিল শিক্ষাসহ সকল অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ন ভাবে, যা তাকে অতীতের সকল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান থেকে সর্বতো ভাবে মুক্তি দিল, যা তার পূর্নাংগ মনুষ্য ও মানবসূলভ অধিকারের নিশ্চয়তা দিল, যা তাকে পাশবিক যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি দিল এবং সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধানে ও ঐক্য এবং সংহতি রক্ষায় তাকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ দিল।

তাই মহাবিজ্ঞানী মহান আল্লাহ তার বিজ্ঞানময় কুরআনকে সিলেবাস স্বরুপ প্রেরন করে মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে আকরাম সাঃ এর মাধ্যমে নারী জাতিকে সাম্যের সুসংবাদ দিয়ে আল কুরআনে বলেন-

''হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুঁজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী''। (সূরা নিসা- ১)

এ প্রসংগে ''ইমাম ইবনে রুশদ শরীয়তের সাম্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মূলত নারী ও পুরুষ, উভয়কে একত্রে শরীয়তের বিধি বিধানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র সেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেখানে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বিশেষ কোন কারনে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ দিয়েছেন।''[১]

ইসলামের আবির্ভাবের পরে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রথমেই তিনি নারী শিক্ষার স্বীকৃতিসহ সকল প্রকার উন্নয়নের জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। নারী শিক্ষাকে নারী পুরুষ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে ঘোষনা দিলেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ ''জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ।'' অন্য এক বর্ণনায় মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে হাদীসের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং ইহা উভয় শ্রেনীর মৌলিক অধিকার। তিনি মহিলাগনকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য মসজিদে আগমনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইহা ব্যতীত মহিলা সাহাবীগনের যখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হত, তখন তারা অবাধে হুজুর সঃ এর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং

Dhaka University Institutional Repository

তার (সাঃ) নিকট হতে অথবা তার মহিয়সী স্ত্রীগনের মাধ্যমে এর সমাধান লাভ করতেন। এ সম্পর্কে আনসারী মহিলাগন অগ্রনী ছিলেন। তাদের সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা হচ্ছে

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন-

''মহিলাদের মধ্যে আনসারী মহিলাগন উত্তম। তাদের ধর্মের শিক্ষার ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রতিবন্ধকতা হতে পারে নাই।''[২]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষা সম্পর্কীয় বৈঠকসমূহে মহিলাগন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকতেন। এ প্রসংগে হযরত খাওলা বিনতে কায়েস রাঃ বলেন —

''জুমুআর দিন হযরত (সাঃ) এর খুতবা আমি সর্বশেষ কাতারে বসে শ্রবন করতাম, এবং যখন তিনি সাঃ অনুভব করতেন যে, মহিলাগন তার ভাষন বুঝতে পারছে না অথবা তার বানী সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না, তখন তিনি সে বক্তব্য পুনরুল্লেখ করতেন।''

মহিলাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি পৃথক দিনও নির্দিষ্ট করেছিলেন। এ প্রসংগে প্রমাননূলক হাদীস হচ্ছে-

''আবূ সাঈদ রাঃ থেকে বর্ণিতা। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূল সঃ এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আপনার হাদীস পুরুষেরা নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আছে মহিলারা রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেছিলেন, আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অর্ধেক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন, নির্ধারন করুন, যে দিন আমরা সবাই আপনার খেদমতে হাজির হব। জবাবে রাসূল (সঃ) বললেন, অমুক দিন, অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রাসূল সঃ সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষা দান করলেন, এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে, জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুটি হয়? বর্ণনাকারী বলেছেন, মহিলা একথাটি দুবার বললে রাসূল (সঃ) বললেন, দুই,দুই।''[৩] (বুখারী ও মুসলিম)

হাফেজ ইবনে হাজার (রাঃ) বলেন- এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দ্বীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমান পাওয়া যায়।[৪]

নিসন্দেহে সত্য যে, এটা ছিল নারী সমাজের অধীর আগ্রহ। মসজিদে নববীতে পুরুষদের পাশাপাশি তারা রাসূল সঃ এর মুখ নিসৃত বানী শ্রবন করাই যথেষ্ট মনে করলেন না বরং এ জন্য বিশেষভাবে আবেদন পেশ করলেন। রাসূল (সাঃ) তাদের এ আগ্রহ অনুমোদন করে তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে দ্রুত দাবী পূরন করলেন।

মহিলাদের প্রশিক্ষন দেয়ার সময় রাসূল সঃ নিজে উপস্থিত থাকতে না পারলে তার পক্ষ হতে কোন প্রতিনিধিকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে উম্মু আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি (সাঃ) আনসারী মহিলাগনকে একগৃহে একত্রিত করে আমাদের কাছে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)কে উপদেশ দানের জন্য প্রেরন করেন। হযরত উমার রাঃ গৃহের দ্বারে এসে সালাম করতেন এবং বলতেন আমি হুযুর সাঃ এর দূত হিসাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। নবী করীম (সাঃ) উভয় ঈদে যুবতী এবং ঋতুবতী মহিলাগনকেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে অনুমতি দিয়েছেন।[৫]

নিম্নোক্ত হাদীসটি থেকে তা প্রমান পাওয়া যায়।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আতা এবং তার থেকে ইবনু জুরায়েজ বর্ণনা করেন-

"কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রাসূল (সাঃ) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন, খুতবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল রাঃ এর হাতের উপর তার হাত দিয়েছিলেন আর বেলাল রাঃ তার কাপড় মেলে ধরছিলেন যাতে মহিলারা দান করছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, - রাসূল সঃ মনে করলেন তার কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি, তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকাকরতে বললেন, ইবনে জুরাইজ আতা সাঃকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মনে করেন, যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই এটা ইমামদের কর্তব্য। কিন্তু তারা এটা করছে না কেন?"[৬] (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে রাসূল (সঃ) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কত বেশী পরিমান গুরুত্ব দিতেন তা সহজেই অনুমেয়। যার কারনে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, তার কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি। তখন তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন। কেননা এটা ছিল শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত মেয়েদের বৈধ অধিকার।

নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি (সাঃ) পিতামাতা ও স্বামীদিগকে এ নির্দেশ দান করেছেন যে, তারা তাদের কন্যা ও স্ত্রীদিগকে ধর্মের নির্দেশাবলী শিক্ষা দিবে। রাসূল (সঃ) পিতামাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

"হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সঃ বলেছেন-কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহন করে তাকে উত্তমভাবে লালন পালন করবে, ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে।"[৭] (বুখারী ও মুসলিম)

আর কন্যাদেরকে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর চেয়ে বড় ইহসান তথা উত্তম লালন পালন আর কি হতে পারে?

নবী করীম সঃ আবার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, স্ত্রীকে মহর দানের পরিবর্তে স্ত্রীকে আল কুরআনের কতিপয় সূরা শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে গিয়ে সাইয়েদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী আল্লামা ইবনুল হাজ্জ এর আল মাদখাল, গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন—"নারী যদি তার স্বামীর কাছে নিজের দ্বীনি অধিকার ও দ্বীন শিক্ষার অধিকার দাবী করে, তাহলে স্বামী নিজে সরাসরি তার সে দাবী পূরনকরবে অথবা এ উদ্দেশ্যে তাকে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করবে। আর এ অধিকার লাভ করার দাবী বিচারকের কাছে পেশ করলে পার্থিব অধিকার পূরনের ব্যাপারে বিচারক তেমনি স্বামীকে বাধ্য করবেন এ অধিকার পূরনের জন্য। কারন দ্বীনি অধিকার সমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার যোগ্য"[৮]

এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিতেও বাধ্য নয়। ইসলামী আইনবিদগনও এ অধিকারের ব্যাপারে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, সাইয়োদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী ফতোয়ায়ে কাজীখানের বরাতে লিখেছেন —

যে সব কারনে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর বাইরে যাওয়ার অধিকারের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো যে, যদি কোন মাসয়ালা জানার প্রয়োজন হয় এবং তার স্বামী যদি ফকীহ না হয়, তাহলে সেটা জানার জন্য সে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ইলমের মজলিসে যেতে পারবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলাম স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে কত উদার ভূমিকা পালন করেছে। নারীদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য রাসূল সঃ অভিভাবকদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেছেন শুধু আযাদ মহিলারাই নয়, ঘরের দাসীবাদীরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকেনি। রাসূল সঃ বলেছেন "যার কাছে একটি বাদী রয়েছে আর সে উত্তম রূপে আদব কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে এই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে।"

এ ছাড়া নবী করীম (সঃ) নারী সমাজকে চিন্তাধারা ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রেরনা দান করেছেন এবং নারীদের শিক্ষা দীক্ষা দানের ব্যবস্থাকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

তিনি (সাঃ) নারী জাতির জন্য সাধারন শিক্ষাসহ লিখন পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন। "তিনি (সাঃ) হযরত শিফা বিনতে আবদিল্লাহ রাঃকে বলেন যে, তুমি হযরত হাফসা রাঃকে যেভাবে লেখা শিক্ষা দিয়াছ অনুরুপভাবে তাকে কীটসংশের যন্ত্রনা নিয়ামায়ের দুআও শিক্ষা দাও।"[৯]

নবী করীম সাঃ কর্তৃক শিক্ষার প্রতি এরুপ গুরুত্ব আরোপের ফলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক মহিলা সাহাবী বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন হযরত আয়েশা রাঃ হযরত উম্মু সালমা (রাঃ) এবং উম্মু ওয়ারাকা রাঃ সম্পূর্ন কুরআন মজীদ মুখস্ত করেছিলেন। হযরত হিন্দ বিনত উসায়দ রাঃ কুরআন মজীদের কতিপয় অংশের হাফিজ ছিলেন। উম্মু সাদ অন্যদিগকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেন। কুরআন মজীদ শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী সঃ বলেন-

خيركم من تعلم القران وعلمه ০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ স্বয়ং পাঠ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম।"

তিনি অন্যত্র বলেছেন, -

''যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের এক অক্ষর পাঠ করবে, সে ব্যক্তি দশটি নেকী পাবে। যেমন---যে ব্যক্তি এই তিনটি অক্ষর পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তাকে ত্রিশটি নেকী প্রদান করবেন।''

তাহলে উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যাচ্ছে কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে তিনি নর নারী সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হাদীস শাস্ত্রে ঃ

রাসূলের যুগের শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন হাদীস ইসলামী আইন ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাফসীর শাস্ত্রে হযরত আয়েশা রাঃ একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যে আটজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়েশা রাঃ তাদের মধ্যে তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবেয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহন করছেন। উল্লেখ্য যে, ''আসমাউর রিজাল গ্রন্থগুলোতে মহানবীর (সঃ) লক্ষাধিক সাহাবার মধ্যে প্রায় একহাজার সাহাবার জীবন বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন হচ্ছেন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।''[১০]

হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে মহিলাদের অবদানও কম নয়। মহিলা সাহাবীগনের এক বিরাট সংখ্যা রাসূল (সঃ) এর কাছ থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেন। উম্মুহাতুল মুমিনীন নবী মহিষীগন ব্যতীত উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) আসমা বিনতে আবী বাকর রাঃ এবং ফাতিমা বিনতে কায়স (রাঃ) প্রমুখ অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবী হিসাবে সুখ্যাত।

ফিকহ শাস্ত্রে ঃ

ফিকহ শাস্ত্রের বহু মহিলা সাহাবী বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জনগনের পথ প্রদর্শনে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করেছে। ফিকহ শাস্ত্রে হযরত আয়শা (রাঃ) এর পদমর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ে ছিল যে, তাকে মুজতাহিদ সাহাবী হিসাবে গন্য করা হত।

অন্যান্য বিষয় ঃ

ইসলামী শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানেও মহিলা সাহাবীগন অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। হযরত আয়েশা রাঃ চিকিৎসা শাস্ত্র, আরবের প্রাচীন ইতিহাস এবং হযরত উম্মু সালমা রাঃ ধর্মের গুঢ়তত্ত্বে জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে উম্মু আতিয়্যা রাঃ রাবী রাঃ বিন্ত মুআওয়ায এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। এক বর্ণনানুসারে রাফীদা রাঃ এর তাবুতে অস্ত্রপচারের যন্ত্রাদি থাকত। এই তাবু মসজিদের নববীর সন্নিকটে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত উম্মু সালমা রাঃ এর ধর্মের জ্ঞান সম্পর্কে। তারপরও উল্লেখ্য যে, তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে এতটা বিচক্ষনতার ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা হুদাইবিয়ার একটি ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির অবাঞ্চিত শর্তের কারনে সাহাবীদের মনে তীব্র আঘাত লাগে। হুজুর (সাঃ) সাহাবাগন রাঃকে তাদের কুরবানীর পশুসমূহ যবেহ করার জন্য তিনবার নির্দেশদান করলেও তারা এতই বিষন্ন ছিলেন যে, তাদের কেহই নিজেদের স্থান হতে উঠলেন না। নবী করীম সাঃ তখন হযরত উম্মু সালমা রাঃ এর কাছে গমন করে ঘটনা বিবৃত করেন। উম্মু সালমা রাঃ বলেন আপনি বাইরে গমন করে স্বয়ং কুরবানী করুন এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। তিনি তাহাই করলেন। ইহা দেখে সাহাবা-ই কিরামগনও তৎক্ষনাৎ নিজ নিজ কুরবানী করেন ও মাথার চুল কাটান।''[১১]

তাহলে উক্ত ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে নারীদের সুপরামর্শকেও রাসূল সঃ গুরুত্ব দিতেন।

সাহিত্য চর্চায় ঃ

সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও মহিলারা মূল্যবান ভূমিকা রেখেছেন। সাহিত্যাকাশে যে সমস্ত মহিলা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তন্মধ্যে হযরত আসমা বিনতে সাকান,আরওয়া বিনত আবদিল মুত্তালিব, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

হযরত আসমা বিনত সাকান এমন উত্তম বক্তা ছিলেন যে, একবার হুযুর সাঃ স্বয়ং তার বিশুদ্ধ ভাষায় অলংকারপূর্ন বক্তৃতার প্রশংসা করেন। বহু মহিলা সাহাবীর ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল, মহিলা সাহাবীদের এই দলটি কবিতাকে তাদের আবেগ ও মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে আরওয়া বিনত আবদিল মুত্তালিব এবং তার ভগ্নি উসামা হিন্দ বিনত হারিস, মায়মুনা রাঃ প্রমুখ কাব্য রচনায় অধিক খ্যাত ছিলেন। হযরত খানসা বিনত আমর আস সুলিয়া উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন। এভাবে মুহাম্মদ সঃ তার তেরশ বছর নবুয়ত কালে একটি ঘুমন্ত চরম জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে যেখানে নারীর কোন রকম মর্যাদা ছিল না। না পারিবারিক, না সামাজিক মোট কথা বলতে গেলে কোন ক্ষেত্রেই তার পদচারনা ছিল না। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে এবং সবার স্ব-স্ব সামগ্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়ে একটি বিশ্ব বিজয়ী জাতিতে কিভাবে রুপান্তরিত করলেন? কোন পরশমনির ছোঁয়া তাদেরকে বিশ্ব বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শক্তি জোগালো? বস্তুত ইকরা বা জ্ঞানার্জনের পথ ধরেই রাসূল সঃ সামনে অগ্রসর হন। তাই তো তিনি একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে রুটি রুজীর শ্লোগান না তুলে বরং সাফা মারওয়ার পাদদেশে দাড়িয়ে কাবাঘরের চত্তরে দাড়িয়ে, উকাজের মেলায় ঘুরে ঘুরে যুদ্ধবন্দীদের মাধ্যমে পড়ার দীক্ষা দিতেন ''তোমরা সবাই জ্ঞানার্জন করো।'' আল্লাহর নবী হিসাবে তিনি ভাল করেই জানতেন, সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করে তুলতে না পারলে, তাদের নৈতিক চরিত্রে সংশোধন ও উন্নতি বিধান করতে না পারলে সমাজে কোন উন্নতি হবে না। তিনি একজন সফল রাষ্ট্র নায়ক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তা অমুসলিম দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ Genuine of Islam গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"I believe that if a man like Mohammad (sm) were to assume the dictatorship in solving its problem in a way that would bring much need peace of happiness"[১২]

"অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ সঃ এর মত ব্যক্তিত্ব যদি এই বিশ্বের নেতৃত্বের পদ অধিকার করে রাখত তাহলে এই অশান্তময় পৃথিবীতে আবারও শান্তির ফুলগুধারা ঝরে যেত।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহানবী (সঃ) কত মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানব ছিলেন যে, তার চরিত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অমুসলিম মনীষীরা পর্যন্ত এ উক্তি করেছেন।

তিনি সাঃ নারী জাতির শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান রেখে গেছেন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র প্রধান অথবা অন্য কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হোক, এমনকি অন্যান্য নবী রাসূলগণও তার সমকক্ষ ভূমিকা রেখে যেতে পারেনি।

তিনি সাঃ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন যা আরও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে — "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"

এ অমিয় বানী দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্যকরনীয়। এমনকি শিক্ষাকে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যেয়েও শিক্ষা লাভ করতে মহানবী সাঃ নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নাই। তাই তো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে -

اطلبوا العلم ولوكان بالصين

এ হাদীসের ভাবার্থ হল এই যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অথচ দূরে অবস্থিত এমন দেশে যেতে কোন বাঁধা নেই। বিদ্যার উপর এরুপ তাকিদ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন নবী রাসূল দেন নি।

উল্লেখ্য যে, বিদেশে যেয়ে শিক্ষা লাভ করা মেয়েদের জন্য নিষেধ নয়।

এছাড়া তিনি বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে বয়স যে কোন মাপকাঠি নয়, সেটারও প্রমান দিয়ে গেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেছেন —

اطلبوا العلم من مد الى لحد

অর্থাৎ "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষন করতে থাক।"

এখানে বুঝা যাচ্ছে জ্ঞানের দ্বার বন্ধ হওয়ার এক মাত্র অন্তরায় হচ্ছে মৃত্যু। তাহলে তার উপারোক্ত হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে জ্ঞান অর্জন যে, জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া তাও আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ সঃ বলে গেছেন। রাসূল সঃ এর লক্ষাধিক সাহাবা ছিলেন বলে জানা যায়। সাহাবা মানে সমাজের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুশিক্ষিত মানুষ। তৎকালীন সমাজে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত লোক একত্রিত করা শিক্ষার প্রতি মুহাম্মদ সঃ এর সরলের বহিঃপ্রকাশ।

নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য তিনি শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদেরকে শিক্ষকতা কাজে নিয়োগ করেছেন। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে-

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিলেন তিনি তাদেরকে নিরক্ষর বালকদের লেখাপড়া শেখানোর শর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন।মুক্তিপনের এননি দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি বলেন-

"যে ব্যক্তির কাছে ইলম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হল কিন্তু সে তা গোপন করল। কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।"

জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মহানবী সাঃ জনগনকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। ''তিনি বলেছেন জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।'' ধর্মীয় যুদ্ধে যারা প্রান হারায়, তাদের স্থান বেহেশতে। অথচ এ উক্তির আলোকে দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানার্জনের জন্য এর চেয়ে উদ্দীপনা মূলক উপদেশ ও নির্দেশ আর কি হতে পারে?

হযরত মুহাম্মদ সঃ আরো বলেন, যে দিন আমি জ্ঞান অর্জন করিনা, সে দিনটা আমার জীবনের অংশ নয়। এ হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা বর্জিত জীবন ব্যর্থ।

তিনি আরো বলেছেন যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা তার নির্দেশিত পথে জ্ঞানার্জন পূন্যের সামিল। যে জ্ঞানের উপদেশ দান করে সে যেন আল্লাহর পথে দান খয়রাত করে। ''যে জ্ঞানের অন্বেষনে বের হয়,আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপকে পুরস্কৃত করেন।" "জ্ঞান অন্বেষন কর, কেননা জ্ঞান তার অধিকারকে ভালমন্দের পার্থক্য নিরুপন করতে সহায়তা করে। স্বর্গের পথ আলোকিত করে।" এছাড়া আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা শিক্ষার পথ তথা নারী শিক্ষার দ্বারকে খুলে দিয়েছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন দেশীয় প্রথাদে অবহেলিত বঞ্চিত ও নিগৃহীত ছিল। ইসলাম আসার পরে অর্থাৎ রাসূল সাঃ এর যুগে নারী তার পরিপূর্ন অধিকারসহ মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। তন্মধ্যে শিক্ষার অধিকার ছিল অগ্রগন্য। যার বদৌলতে নারী সমাজ মাথা উঁচু করে দাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য অধিকারের মধ্যে রয়েছে কন্যা হিসেবে, মাতা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্বে আরবে নারীকে মোটেই মূল্যায়ন করা হত না। তারপর রাসূল সাঃ এসে তাদেরকে অধিকার প্রদান করে। এছাড়া রাসূল (সাঃ) যুগে মেয়েরা তাদের প্রয়োজন ও জীবন ধারনের তাগিদে কারিগরি ও সামাজিক কাজে অংশ গ্রহন করতো। যেমন-সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, সমাজ কল্যান, সমাজসেবা ও বৈধ বিনোদন।

আবার কোন কোন সময় রাজনৈতিক সমস্যায় অংশ নিতো। কায়িক পরিশ্রম,ও কারিগরি ক্ষেত্রে মেয়েরা পশুপালন, কৃষিকাজ হস্তশিল্প, ব্যবস্থাপনা,চিকিৎসা, নার্সিং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গৃহকর্মে ব্যাপৃত

Dhaka University Institutional Repository

হতো। তবে উল্লেখ্য যে দুটো জিনিস তাদেরকে এ কাজ করতে বাধা করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে দারিদ্র ও অক্ষনতা থেকে বাচিয়ে মর্যাদাপূর্ন জীবন যাপন করার দায়িত্ববোধ।

দ্বিতীয়ত ঃ

উপার্জিত অর্থ সাদকা করে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্মান ও উচ্চস্থান লাভ করার প্রেরনা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায়,ইসলাম পরবর্তী যুগে নারীরা যে নানা দিক দিয়ে এতটা সম্মান অর্জন করেছিল তার মূলে ছিল মুহাম্মদ সঃ কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যমে নারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। তারা যদি লেখাপড়া না জানত তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তারা অজ্ঞ থেকে যেত। তারা কুরআন,হাদীস ও শরীয়াতের অনান্য বিষয় সম্পর্কে এতটা জানত না। যার ফলে বড় বড় বিদুষী মহিলা সাহাবীদের জন্ম নেয়া ছিল অসম্ভব। তাই বলা যায় রাসূলে করীম সঃ এর যুগে নারী শিক্ষা পরিপূর্নতায় পৌছে ছিল। রাসূলে করীম সঃ নিজে বলেছেন ''আমি জগতের মহান শিক্ষক রুপে প্রেরিত হয়েছি।''

সেই মহান শিক্ষকের শিক্ষার মাধ্যমে নারী পেয়েছিল জাহিলিয়াতের অজ্ঞতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি। তাই কবি নজরুল তার ''নারী কবিতায় লিখেছেন-

''যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না, নারীরা আছিল দাসী। বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি. কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডংকা বাজি। নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এরপর যুগে আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।

যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।''

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। আবদুল হালীম আবূ শুককাহ ''রাসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা। পৃষ্ঠা নং-৮৬।

২। মুসলিম শরীফঃ কিতাবুল ইলম।

৩। সহী বুখারী ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ। নবী (সঃ) নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই কোন কাটছাট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়া শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা সহ মুসলিম ঃ শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন অনুচ্ছেদ, ৮খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৪। ফতহুল বারী ঃ ১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৫। সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী ''ইসলামী সমাজে নারী'' পৃষ্ঠা -৯৪।

৬। সহী বুখারী ঃ দুই ঈদ অধ্যায়, ঈদের দিনে মহিলাদের উদ্দেশ্য ইমামের উপদেশ অনুচ্ছেদ, ৩খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ দুই ঈদের নামাজ অধ্যায় ৩খন্ড ১৮ পৃষ্ঠা।

৭। সহী বুখারী ঃ শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৮। আল মাদখালু লি ইবনিল হাজ্জ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭।

৯। মসনদ (ষষ্ঠ খন্ড) পৃঃ ৩৭৩।

১০। মাওলানা সয়ীদ আনসারী রহঃ ''মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ। পৃষ্ঠা নং-১৫''

১১। সহীহ বুখারী (ষষ্ঠ খন্ড) পৃ ঃ৩৮০।

১২। Genuine of Islam গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৩

মহিলা সাহাবীদের সময়ে নারী শিক্ষা ঃ

মহিলা সাহাবীদের যুগেও নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল মহিলা সাহাবীদের পদচারনা নারী শিক্ষার পথকে করেছে সুপ্রশস্ত, যাদের অনাবদ্য অবদানের জন্য নারী শিক্ষা আজও আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রের মত দেদীপ্যমান তাদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাঃ বিশেষভাবে খ্যাত। যিনি একাধারে ছিলেন তাফসীরকারক, মুহাদ্দিসা, ফকীহা, চিকিৎসাবিদ ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী। এমন একজন মহিয়সী নারীর জীবন সম্পর্কে আলোচনা, সুন্দরভাবে পরের অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে তার আগে যে সমস্ত কতিপয় মহিলা সাহাবী হাদীস বর্ননা ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা ঃ

হাফেয যাহবী বলেন, ''হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন প্রমান পাওয়া যায় না''[১]

ইমাম শাওকানী বলেন ঃ

''উলামায়ে কেরামের কারো পক্ষ থেকে এ প্রমান পাওয়া যায় না যে, তিনি কোন মহিলার বর্ণনাকে মহিলা হওয়ার কারনে প্রত্যাখান করেছেন। এমন বহু হাদীস রয়েছে যা একজন মহিলা সাহাবী বর্ণনা করেছেন আর গোটা উম্মত তা নির্দ্বিধায় গ্রহন করেছে। ইলমে হাদীস সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান রয়েছে তিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন না।''[২]

হযরত হাফসা রাঃ

''হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। অবশ্য ইন্তিকালের এক বছর পূর্ব থেকে তিনি নফল সালাত বসে আদায় করেছেন। তখন ধীর ও শান্তভাবে দীর্ঘক্ষন ধরে সূরা তেলাওয়াত করতেন।''[৩] (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসটি মুসলিম শরীফ থেকে নেয়া। তিনি মহানবী সঃ এর পত্নী ছিলেন। বর্ণনা মতে জানা যায়

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সুফিয়া থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে। যেগুলো তিনি হযরত রসূলে করীম সঃ এবং হযরত উমরের রাঃ কাছ থেকে শুনেছিলেন।

তার যথেষ্ট দ্বীনি প্রজ্ঞা ছিল। সেটা প্রমানের জন্য নিম্নোক্ত ঘটনা যথেষ্ট। একবার নবীজি বললেন, আমার একটি ধারনা বদর এবং হোদায়বিয়ায় অংশ গ্রহনকারীরা দোযখে যাবেনা। হযরত হাফসা বললেন, কিন্তু কুরআন তো বলছে, তোমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি দোজখে যাবে। মহানবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ তবে কুরআনে একথাও আছে—আবার শুদ্ধ পূন্যবানদের তিনি মুক্তি দেবেন এবং অত্যাচারীদের জানুর উপর ফেলে ছেড়ে দেবেন।

এই অন্বেষী মানুষের প্রভাবে রসূলে খোদা (সঃ) সব সময় তার শিক্ষার কথা ভাবতেন। তিনি এত দ্বীনদার ছিলেন যে, তার চরিত্র বিষয়ে ঐতিহাসিক ইবনে সাঁআদের উক্তি

তিনি (হাফসা) দিনে রোজাযাপনকারী এবং রাত্রে নামাজে দন্ডায়মান থাকতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে-

''মৃত্যু অবধি রোজা রেখেছিলেন তিনি,,দ্বীনের পরামর্শের ব্যাপারে তিনি যে, প্রজ্ঞাবান ছিলেন তা একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়-তিনি বিতর্ক অপছন্দ করতেন, সিফফিন যুদ্ধের পরে যখন প্রশাসন বিষয়টি উপস্থাপিত হলো, তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ এটিকে ''ফিতনা ''(অবক্ষয়) ধারনা করে গৃহে অন্তরীন থাকতে চাইতেন, কিন্তু হাফসা রাঃ বললেন, যদিও এই অংশ গ্রহনে তোমার কোন লাভ নেই। কিন্তু তবুও তোমার অংশ গ্রহনের প্রয়োজন আছে, কেননা মানুষ তোমার বিবেচনার জন্য প্রতীক্ষা করবে এবং অসম্ভব নয় যে, তোমার নিসঙ্গ গৃহবাস তাদেরকে বিতর্কের মধ্যে ডুবে দেবে।

এভাবে হাদীস বর্ণনায় দ্বীনের ব্যাপারে সৎ পরামর্শে তার অবদান ছিল অসাধারন।

হযরত উম্মে সালমা রাঃ-

হযরত উম্মে সালমা রাঃ থেকে বর্ণিত ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে মানুষ ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের একপক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় বক্তব্য পেশ করতে অধিকতর পারদর্শী হওয়ায় আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি এবং তার সপক্ষে রায় দিয়ে দেই। আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার ক্ষুন্ন করে রায় প্রদান করে থাকি তবে তা হবে আগুনের টুকরো। সে চাইলে তা গ্রহন করতে পারে বা পরিত্যাগও করতে পারে।''[৪] (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে তিনি অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করে নারী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছিল জ্ঞানের দিক থেকে যদিও সমস্ত পত্নী উচ্চ স্তরের অধিকারী ছিলেন, তবুও হযরত আয়েশা রাঃ এবং উম্মে সালমা (রাঃ) তাদের মধ্যে তুলনাহীন ছিলেন। যেমন মাহমুদ বিন লবিদের উচ্চারন।

Dhaka University Institutional Repository

''যদিও মহানবীর সকল পত্নী রাসূলে খোদার প্রচুর হাদীস স্মৃতিধার্য করেছিলেন, তবুও তাদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাঃ এবং উম্মে সালমার (রাঃ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।''[৫] মারওয়ান বিন হেকম তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন ঃ

كيف نسأل احدًا وفينا ازواج النبي (صلى الله عليه وسلم)

অর্থাৎ ''মহানবীর পত্নীরা থাকতে আমরা অন্যদের কাছে কি জিজ্ঞেস করবো?''[৬]

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জ্ঞানের সমুদ্র হওয়া সত্ত্বেও উম্মে সালমার জ্ঞান সমুদ্র থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিলেন না, তাবেয়ীনদের একটি বড় অংশও তার বিদ্যা শিবিরে আসত। কুরআন মজীদ ভাল পড়তেন এবং মহানবীর মতো পড়তে পারতেন একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, মহানবী সাঃ কিভাবে কুরআন পাঠ করতেন? তিনি বললেন, এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। এরপর নিজে পড়ে দেখালেন।

হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর, আয়েশা ছাড়া অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। উম্মে সালমা রাঃ থেকে ৩৭৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। এই হিসাবে তিনি সাহাবী হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী।

তিনি হাদীস শুনবার গভীর আগ্রহ লালন করতেন। একদিন বিনি কেটে চুল ঠিক করছিলেন সে সময় মহানবী (সাঃ) খোতবা দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হলেন। মহানবী ''হে সমবেত মানুষ'' উচ্চারন করতেই তিনি তাড়াতাড়ি চুল বেধে ঝটপট দাড়িয়ে গেলেন এবং মহানবীর পুরা বক্তৃতা শুনলেন।

এর থেকে বুঝা যাচ্ছে তিনি অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছিলেন। ইসাবা গ্রন্থাকার তার সম্পর্কে বর্ণনায় বলেছেন-

صاحب العقل البالغ والرأى الصائب

অর্থাৎ উম্মে সালমা পূর্ন প্রজ্ঞাবান ও বিশুদ্ধ বিবেচক ছিলেন।

মনীষী ইবনে কিয়াম লিখেছেন '' উম্মে সালমার ফতোয়াসমূহ যদি একত্রিত করা যায়, তাহলে তা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তৈরী হতে পারে''।[৭] এবং তার ফতোয়া সমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলোর অধিকাংশই ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী উভয়ই সমর্থন করেছেন এবং এই মতৈক্য তার জটিল দূরদর্শী মেধা ও মনীষীর একটি দৃষ্টান্ত।

তার দূর দর্শী মনীষার নিম্নোক্ত ঘটনা সাক্ষ্য প্রদান করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) আসরের নামাজের পর দুরাকাত নামাজ পড়তেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন। আপনি এ নামাজ কেন. পড়েন? তিনি বললেন কারন মহানবী সাঃ ও পড়েছেন এবং তিনি এই হাদীস আয়েশা রাঃ সূত্রে শুনেছেন। মারওয়ান সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে হযরত আয়েশার কাছে

Dhaka University Institutional Repository

লোক পাঠালেন। আয়েশা রাঃ বললেন, তিনি এ হাদীস উম্মে সালমার (রাঃ) সূত্রে পেয়েছেন। তখন উম্মে সালমার (রাঃ) কাছে লোক গেল এবং তাকে এ কথা জানানো হল। তিনি বললেন-

আল্লাহ আয়েশাকে ক্ষমা করবেন, তিনি আমার কথা বোঝেননি, আমি কি তাকে এ কথা বলিনি যে মহানবী সঃ সেই নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

একবার কিছু সাহাবী তাকে বললেন, রাসূলের অন্তর্জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। উম্মে সালমা রাঃ বললেন, তার অন্তর ও বাহির একই রকম। এরপর মহানবী (সাঃ) এলে উম্মে সালমা রাঃ এই কথা তাকে জানালেন। মহানবী সাঃ বললেন তুমি খুব ভাল করেছ।

হযরত উম্মে সালমা রাঃ পরিষ্কার উত্তর দিতেন এবং চেষ্টা করতেন যা প্রশ্ন কারীর প্রত্যাশা পূর্ন হয়ে যায়। একবার একজনের কি একটি বিষয় সম্পর্কে বললেন, সে ব্যক্তি তার কাছ থেকে উঠে অন্য স্ত্রীদের কাছে গেলেন, তারাও একই উত্তর দিলেন। সে ফিরে এসে উম্মে সালমা (রাঃ) কে এই সংবাদ দিলেন। সালমাকে (রাঃ) বললেন, অপেক্ষা কর, আমি তোমার প্রত্যাশা পূরন করবো, আমি এ বিষয়ে রসূলে খোদার (সঃ) হাদীস শুনেছি।

হাদীস, ফিকহ ছাড়াও বৈষম্য বিজ্ঞান বিষয়েও উম্মে সালমার জ্ঞান ছিল। এই শাস্ত্রে হযরত হোজাইফা রাঃ ছিলেন বিশিষ্ট বিদ্বান। একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) উম্মে সালমা রাঃ এর কাছে এলে উম্মে সালমা রাঃ বললেন, রসূলে খোদার কথা-কিছু সাহাবী এ রকম আছে, যাদেরকে আমার মৃত্যুর পরে আমিও দেখবো না, তারাও আমাকে দেখবে না। রাসূল সাঃ এর এই বানী শুনে ভীত হয়ে আবদুর রহমান বিন আউফ রাঃ হযরত উমরের রাঃ কাছে গেলেন এবং তাকে এই হাদীসের কথা জানালেন, হযরত উমর রাঃ উম্মে সালমার রাঃ কাছে এলেন এবং বললেন, সত্য করে বলুন আমিও কি তাদের মধ্যে আছি? উম্মে সালমা রাঃ বললেন না, তবে তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে আলাদা করবো না। তাহলে দেখা যাচ্ছে রহস্য বিজ্ঞানে কত পরিমান পারদর্শী ছিলেন। হযরত উম্মে সালমার রাঃ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা সংখ্যায় অনেক, সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

আবদুর রহমান বিন আবি বকর, উসামা বিন যাইদ, হিন্দ বিনতে আন হারেস, আল সুফিয়া বিনতে শায়বা, উমরা রাঃ, জয়নব রাঃ, নুবহান গোলাম; আবদুল্লাহ বিন রাফি নাফে; শুআবা; হাসান বসরীর আম্মা খিইরা। সুলাইমান বিন ইসার; আবু উসমান আল হিন্দি; হানীদ; আবু সালমা; আব্দুর রহমান ইবনে হারেস, ইবনে হিশাম, ইকরামা আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান; উসমান বিন আবদুল্লাহ; উরওয়া বিন জুবাইর; ইবনে আব্বাসের গোলাম কুরাইব প্রমুখ।

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ ঃ

''হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ সঃ তার কাছে সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আরব বাসী যে অকল্যানের নিকটবর্তী হয়েছে তাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রাচীর আজকে একটুকু খুলে দেয়া হয়েছে, এ বলে তিনি বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলি গোল করে দেখালেন। তখন জয়নাব বিনতে জাহাশ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

রসূল আমরাও কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মধ্যে উত্তম লোকেরা রয়েছে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে''[৮] (বুখারী মুসলিম)

এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী সাঃ এর পত্নী ছিলেন। তিনি অবশ্য কম হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীস গ্রন্থসমূহে তার কাছ থেকে কেবল এগারটি হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণনা কারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন। হযরত উম্মে হাবিবা রাঃ, যয়নব বিনতে আবি সালমা (রাঃ), মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ, কুলসুম বিনতে তালাক এবং নয়কুর (গোলাম)

উম্মে হাবিবা রাঃ

উম্মে হাবিবা থেকে বর্ণিত, ''একদা তিনি এরূপে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ আমার স্বামী রাসূল সঃ পিতা আবু সুফিয়ান এবং ভাই মুআবিয়া প্রমুখের সাথে আমাকে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুযোগ দাও। একথা শুনে রাসূল সাঃ বললেন তুমি আল্লাহর কাছে এমন কিছু সময়, দিন ও রিযিকের আবেদন করলে যা পূর্বেই নির্ধারন করা হয়েছে। কোন কিছুই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে সংঘটিত হবে না। এর চেয়ে তুমি যদি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম বা কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতে, তাহলে সেটাই ছিল কল্যানকর ও উত্তম। বর্ণনা কারী বলেন, এরপর তার কাছে বানর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। বর্ণনাকারী মিস্আর বলেন, আমার মনে হয় তার কাছে শুকরে পরিনত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে রাসূল সঃ বলেছিলেন, আল্লাহ যে জাতিকে অন্য জীবজন্তুতে পরিনত করেছিলেন তাদের কোন উত্তর সূরী বা প্রজন্মই তিনি রাখেননি বানর বা শুকর তো পূর্বেও ছিল।''[৯] (মুসলিম)

হাদীস শাস্ত্রে এ মহিলা সাহাবীর ভূমিকা কম নয়। হযরত উম্মে হাবিবা রাঃ এর নিকট থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহে ৬৫টি হাদীস আছে। বর্ণনাকারীদের সংখ্যাও কম নয়, কয়েকজনের নাম; হাবিবা (কন্যা), মুয়াবিয়া এবং উকবা (আবু সুফিয়ানের পুত্রদ্বয়) আবদুল্লাহ বিন উকবা, আবু সুফিয়ান বিন সয়ীদ, সাকাফি (ভাগিনা), সালেম বিন সেওয়ার (গোলাম) আবুল জারাহ, সুফিয়া বিনতে শাইবা, জয়নব বিনতে আবু সালমা, উরওয়া বিন জুবাইর, আবু সালেহ আয্ সম্মান, শহর ইবনে হাওশাব। তিনি হাদীসের উপর অত্যন্ত কঠোরভাবে আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও এই বিষয়ে তাগদা দিতেন। একবার তার ভাগিনা আবু সুফিয়ান বিন সয়ীদ বিন মুগিরা এলেন এবং যবের আটা খেয়ে তিনি যখন কুলি করলেন, উম্মে হাবিবা রাঃ বললেন, তোমার অজু করা উচিৎ কেননা নবীজীর নির্দেশ হচ্ছে যে জিনিস আগুনে রন্ধন নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যবহার করলে অজু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ প্রথমে ছিল কিন্তু পরে রসুলে খোদা (সাঃ) আর বাকী রাখেননি সাহাবারা আগুনের পাকানো জিনিস খেতেন এবং যদি প্রথম থেকে অজু থাকতো, দ্বিতীয়বার অজু করতেন না। বরং প্রথম অজু থেকেই নামাজ পড়ে নিতেন।

হযরত জুয়াইরিয়া রাঃ

''হযরত জুয়াইরিয়া থেকে বর্ণিত একবার রাসূল সঃ তার কাছ থেকে অতি প্রত্যুষে যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন বেরিয়ে গেছেন। এ সময় জুয়াইরিয়া তার সালাত আদায়ের স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

বসে ছিলেন। এরপর রাসূল (সাঃ) দুপুরের পর ফিরে আসলেন। তখনও তিনি বসে ছিলেন। রসূল সঃ বললেন, তোমাকে যেখানে বসে থাকতে দেখে ছিলাম তুমি এখনও সেখানে বসে আছ? জবাবে তিনি বললেন, জি হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ; এরপর তিনি বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর যে চারটি কথা তিনবার বলেছি, সেগুলি যদি তোমার সারাদিনের কথার সাথে ওজন দেয়া হয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভারী হবে।" আর তা হলো –

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته -

''মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতার ঘোষনা দিচ্ছি তার সৃষ্টি, সন্তুষ্টি, আরশের ওজন ও তার প্রশংসা লেখার প্রয়োজনীয় কালি পরিমান।''[১০] (মুসলিম)

তিনিও জ্ঞানের বিস্তার করার জন্য রাসূলে খোদা (সঃ) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-তার কাছ থেকে নিম্নোক্ত মহান ব্যক্তিবর্গ হাদীস শ্রবন করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ), জাবির রাঃ, আবদুল্লাহ বিন উমর রাঃ। উবাইদ বিন আসসিয়াক; তোফায়েল, আবু আইউব মরাগি, কুলসুম ইবনে মুসতালাক, আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, কুরাইব।

401853

হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই (রা)

"সফিয়া বিনতে হয়াই থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে রসূলুল্লাহ সঃ এর সাথে সাক্ষাত করতে মসজিদে এসেছিলেন। তখন রাসূল সাঃ ইতিকাফে ছিলেন। তিনি কিছু সময় তার সাথে কথাবার্তা বলে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে দাড়ালেন। রসূল সঃ ও তার সাথে উঠলেন। সুফিয়া যখন মসজিদে উম্মে সালমার দরজার কাছে পৌছলেন। তখন সেখান দিয়ে দুজন আনসার পথ অতিক্রম করছিল। তারা রসূল (সঃ)কে সালাম দিল। তারপর রাসূল সঃ তাদেরকে বললেন এ হচ্ছে সফিয়া বিনতে হয়াই। তখন তারা দুজন বলে উঠল। সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপারটি তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। এরপর রাসূল সঃ বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে, তাই আমার আশংকা হয়েছে হয়তো বা সে তোমাদের অন্তরে খারাপ কিছুর উদ্রেক করে দেবে।"[১১] (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারে হাদীস বর্ণনা করে গেছেন।

হযরত সাফিয়ার কাছ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে যেগুলো হযরত জয়নুল আবেদীন, ইসহাক বিন আবদুল্লাহ, বিন হারিস, মুসলিম বিন সফওয়ান, কিনানা এবং এজিদ বিন মাআতাব প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য নবী পত্নীগনের মতো হযরত সাফিয়া রাঃ ও নিজ কালে জ্ঞানের কেন্দ্র ছিলেন। হযরত সুহায়রা বিনতে জিফর হজ্জ করে হযরত সাফিয়ার (রাঃ) কাছে মদীনায় এলেন, তখন কুফার বহু রমনী ইসলামী শরীয়তের বিধি নিষেধ জানবার জন্যে হযরত সাফিয়ার কাছে বসা ছিলেন। হযরত সুহায়রারও

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য এরকম ছিল, এজন্য তিনি কুফার মহিলাদের দিয়ে হযরত সাফিয়াকে প্রশ্ন করান। একটি বিষয় ছিল মদ বিষয়ে হযরত সাফিয়া রাঃ শুনে বললেন, ইরাক বাসীরা এই বিষয়টি প্রায় সময়েই জিজ্ঞেস করেন।

উক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে শরীয়তের নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য তার কাছে মানুষ আসত। এতে তার জ্ঞানের ব্যাপকতা বুঝা যায়।

হযরত মায়মুনা রাঃ

"হযরত মায়মুনা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল সাঃ সিজদা করতেন, তখন কনুই ও উরুর মাঝে এতটা ফাঁক করতেন যে পিছন দিক দিয়ে তার বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন তখন বাম উরুর উপর শান্তভাবে বসতেন।"[১২] (মুসলিম)

হযরত মায়মুনার কাছ থেকে ৪৬টি হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীস বর্ণনার কোন কোনটি থেকে তার ফিকাহ বিষয়ক অভিজ্ঞানের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ বিমর্ষ ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন বৎস! কি ব্যাপার কারন কি? হযরত ইবনে আববাস স্ত্রীর কথা বললেন, এবং স্ত্রীর ঋতুকালীন কথা বললেন। হযরত মায়মুনা বললেন কি সুন্দর! আমার ঋতুকালীন সময়ে নবীজী সঃ আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোতেন এবং কুরআন শরীফ পড়তেন এবং এই রকমভাবে আমরা চাটাই উঠিয়ে তা মসজিদে রেখে আসতাম এবং কখনও এ হাতেই হতো।

এভাবে তিনি শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিতেন। হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে যেসব বুর্জগ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম হচ্ছে,—

হযরত ইবনে আববাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, ইবনুল হাদ, আবদুর রহমান বিন আস সায়েব, ইজিদ বিন আহম্মদ এরা সবাই তার ভাগিনা ছিলেন) উবাইদ উল্লাহ খওলানী, বেবইয়া, আতা ইবনে ইসার, সোলায়মান বিন ইসার (গোলাম) ইব্রাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন মাঅবাদ, ইবনে আববাস, কুরাইব (আবদুল্লাহ ইবনে আববাসের গোলাম) উবাইদুল্লাহ বিন মাববাক, উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা, আলিয়া বিনতে সবিই। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন-

''মায়মুনা আল্লাহকে অনেক ভয় করতেন এবং অপরের কল্যাণ করতেন''

আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ ঃ

''হযরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সঃ বলেছেন, হাউসে কাউসারের কাছে থাকাকালীন তোমাদের যারা আমার কাছে উপস্থিত হবে তাদের দিকে চেয়ে থাকব। একসময় দেখব, আমার পিছন থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! এরাতো আমারই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি কাজ করেছে? আল্লাহর শপথ এরা জাহেলী যুগে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাই করেছিল।''[১৩] (বুখারী ও মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী সঃ এর কাছ থেকে হযরত আসমা রাঃ ৫৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। এগুলো সুনান এবং সহী হাইন এ উদ্বৃত আছে। তার হাদীসের বর্ণনা কারীরা হলেন আবদুল্লাহ, উরওয়া, (পুত্রদ্বয়) ফাতিমা বিনতে মানযার, ইবনে জুবাইর উবাদা বিন হামযা বিন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন কায়সান, ইবনে আববাস, সুফিয়া বিনতে শায়বা, ইবনে আবি সুলাইকা, ওহাব বিন কায়মান, আবূ বকর, আমের, মুত্তালিব বিন হিনতাব, মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, মুসলিম মুয়াররা, আবু নওফাল বিন আবূ আকবর প্রমুখ।

وعن اسماء ايضا قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس ٠

''হযরত আসমা রাঃ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে; চন্দ্রগ্রহনের সময় আমাদের দাসমুক্তির নির্দেশ দেয়া হতো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে; রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যগ্রহনের সময় দাসমুক্তির আদেশ দিতেন।''[১৪] (বুখারী)

উম্মে সুলাইম রাঃ

উম্মে সুলাইম থেকে বর্ণিত। ''তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সঃ তার কাছে আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। উম্মে সুলাইম তার বিশ্রামের জন্য চাদর বিছিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ খুব বেশী ঘামতেন। তিনি এই ঘাম সুগন্ধি মিশিয়ে পাত্রে সংগ্রহ করে রাখতেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সঃ জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সুলাইম তুমি কি করছ? জবাবে তিনি বললেন, আপনার ঘাম আমি সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করি।''[১০] (মুসলিম)

উক্ত হাদীস থেকে স্বামী তথা রাসূল প্রেমের নমুনা পাওয়া যায়। হযরত উম্মে সুলাইমের সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। সেই হাদীসসমূহ হযরত আনাস রাঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস রাঃ। হযরত জায়েদ বিন সাবিত রাঃ, আবু সালমা এবং আমর বিন আসেম তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। লোকেরা তার থেকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতো, হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিতের মধ্যে একটি মাসআলায় বিতর্ক হয়। তখন তারা উম্মে সুলাইমকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়।

মাসআলা জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে তার কোন লজ্জা ছিল না। একবার মহানবী (সাঃ) কাছে এলেন এবং বললেন, নবীজি! আল্লাহ তায়ালা সত্য কথার ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না-স্বপ্নের কারনে মেয়েদের উপর গোসল ফরজ কিনা বলবেন কি? উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা রাঃ এই প্রশ্ন শুনছিলেন, অকস্মাৎ হেসে ফেললেন, বললেন, উম্মে সুলাইম! তুমি মেয়েদের খুব লজ্জিত করলে আচ্ছা বল তো, মেয়েদের কখনো আবার তা হয় নাকি? মহানবী সঃ বললেন; কেন হবে না? তা না হলে বাচ্চারা মায়েদের অবিকল আকৃতির হয় কেন?

উম্মে আতিয়্যাহ রাঃ

''উম্মে আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সঃ এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছি আমি পুরুষদের বাহনের পেছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম আর রোগী ও আহতদের সেবা শুশ্রুষা করতাম।''[১৬] (মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কয়েকটি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তার হাদীসের বর্ণনা কারীরা হলেন, হযরত আনাস রাঃ, ইবনে সিরীন রাঃ, হযরত হাফসা বিনতে সিরীন রাঃ, ঈসমাইল ইবনে আবদুর রহমান। আলী ইবনে কমর, উম্মে শারাহিল প্রমুখ।

সাহাবা এবং তাবেয়ীন তার কাছ থেকে শবদেহ গোসল করানোর পদ্ধতি শিখে নিতেন।

উম্মে শুরাইক রাঃ

উম্মে শুরাইক থেকে বর্ণিত। রাসূল সঃ তাকে সাপ মারার হুকুম দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭]

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম ঃ

''আল্লাহর সৃষ্টি সকল অনিষ্টকর জন্তু থেকে পূর্ন প্রশংসার মাধ্যমে তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তাহলে কোন জন্তুই ঐ স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়া পর্যন্ত তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।''[১৮] (মুসলিম)

তিনি মহানবী (সাঃ) থেকে ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনা কারীদের মধ্যে আছেন হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ। যায়ীদ বিন মুসাইয়াব, বশীর বিন সায়ীদ, উরওয়া এবং রুবাই বিন নালিক প্রমুখ।

উম্মুল হুসাইন রাঃ

উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সঃ এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। সেখানে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন। তন্মধ্যে একটি কথা হলো, যদি কোন নাক কাটা দাসও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় (রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন নাক কাটা কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নত অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।''[১৯] (মুসলিম)

উক্ত হাদীসে নেতার প্রতি আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে।

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাঃ

''উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করে যে ব্যক্তি মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে দেয় তাকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না।''[২০] (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উম্মে হানী

''হযরত উম্মে হানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন আর তার কন্যা ফাতিমা তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে ওখানে? আমি বললাম,

Dhaka University Institutional Repository

আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। গোসল শেষ হলে তিনি আট রাকাত সালাত একই কাপড় জড়িয়ে আদায় করলেন।''[২১] (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উম্মে হানির রাঃ সূত্রে ৪৬টি হাদীস বর্ণিত আছে, তাদের বর্ণনাকারী হলেন; জাঅদা ইয়াহইয়া, হারুন আবু মুররা , আবু সালেহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস , আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন নৌফল ইবনে আবি লায়লা। মুজাহিদ, উরওয়া, আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ শুঅবা, আতা, কুরাইব, মুহাম্মদ বিন উকবা প্রমুখ। নবীজী (সাঃ) এর কাছ থেকে কখনও কখনও তিনি মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন যা থেকে তার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের ইংগিত মেলে। একবার এই আয়াতের ভাষ্য জিজ্ঞেস করেন ওয়া তাতুনা ফি নাদিকুমুল মুনকার।''

ফাতেমা বিনতে কাইস (রাঃ)

''ফাতেমা বিনতে কাইস, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরার সাথে আমার বিবাহ হল তিনি তখনকার কুরাইশদের উত্তম যুবক। আর তিনি রসূলুল্লাহ সঃ এর সাথে প্রথম জিহাদেই শাহাদত বরন করেন। আমি বিধবা হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ সঃ তার ক্রীত দাস উসামা ইবনে যায়েদের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ এর এই কথাটি শুনতে পেয়েছিলাম যে, তিনি উসামা সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকে ভালবাসে। যখন তিনি আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন, তখন আমি বললাম, আমার ব্যাপারটি সম্পূর্ন আপনার হাতে ন্যস্ত, আপনি যাকে ভাল মনে করেন তার সাথেই আমাকে বিবাহ দিতে পারেন না।''[২২] (মুসলিম)

ফাতেমা রাঃ মহানবী সঃ এর কাছ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন যেগুলো বেশ কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত আছে, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরুপ। কাসেম বিন মুহাম্মদ, আবূ বকর ইবনে আবূল জাহাম, আবূ সালমা, সয়ীদ ইবনে মুসাইয়ার, উরওয়া, আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, শামওয়াদ , সোলায়মান বিন ইয়াসার, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সওবান, শুঅবা, আবদুর রহমান ইবনে আসেম প্রমুখ।

উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা

''উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা ইবনে নোমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা ক্বাফ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র জবান থেকে মুখস্থ করেছি। প্রতি জুমআর খুতবায় তিনি এই সুরা পাঠ করতেন। রসূলুল্লাহ সঃ এর রুটি তৈরী করার চুলো এবং আমাদের চুলো একই ছিল।'' (মুসলিম) [২৩]

রবী বিনতে মুআওয়াম রাঃ ঃ

''রবী বিনতে মুআওয়ায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আশুরার দিন সকাল বেলা আনসারদের মহল্লায় লোক পাঠিয়ে ঘোষনা করেছে, যেন দিনের বাকী অংশে খাওয়া দাওয়া না করে। আর যে রোজা রেখেছে সে যেন রোজা অবস্থায়ই থাকে। এরপর থেকে আমরা আশুরার রোজা নিয়মিত রাখতাম।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের ছেলেমেয়েদেরকেও রোজা রাখতাম। রংগিন পশম দিয়ে তাদেরকে খেলনা বানিয়ে দিতাম। কেউ খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করলে, তাকে তা দিতাম, এভাবে ইফতার পর্যন্ত চলতো।''[২৪] (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়া আরও অসংখ্য মহিলা সাহাবী হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে অক্ষয় ও অমর হয়ে আছেন। যাদের অবিস্মরনীয় অবদান হাদীস শাস্ত্রকে করেছে ফুলে ফলে সুশোভিত, যা নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে তরান্বিত ভূমিকা পালন করেছে। যাদের পথ ধরে আজও মুসলিম নারীরা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা হচ্ছেন-

হযরত সাওদা রাঃ, হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাঃ, হযরত জয়নব বিনতে আবি মুয়াবিয়া রাঃ, হযরত আসমা বিনতে এজিদ (রাঃ), হযরত উম্মে দারদা রাঃ, প্রমুখ।

তবে উল্লেখ্য যে, সকল মহিলা সাহাবীদের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞানের সকল শাখায় হযরত আয়েশা সিদ্দিকার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে তথা নারী শিক্ষার দ্বারকে উন্মোচন করে গেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইসলামের ইতিহাসের সেই জ্ঞান তাপসী নারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। আবুল ফজল ইব্রাহীমের গবেষনামূলক পর্যালোচনা সহকারে যাহাবী প্রনীত মীজানের ভূমিকা ঃ

২। নাইলুল আওতার ৮ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা

৩। সহী মুসলিম ঃ মুসাফিরদের নামায অধ্যায় নফল নামায দাড়িয়ে ও বসে পড়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ২ খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৪। সহী বুখারী ঃ অত্যাচার ও জুলুম অধ্যায়, জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন মহাপাপ অনুচ্ছেদ ৬ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দান অধ্যায়, প্রকাশ্য দলিলের ভিত্তিতে আইনের ভুল ব্যাখ্যা দান অনুচ্ছেদ ৫ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা

৫। তাবকাত-ই ইবনে সা'আদ ঃ (দ্বিতীয় খন্ড)¯ পৃঃ ১২৬

৬। মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ঃ(ষষ্ঠ খন্ড) পৃ ঃ৩১৭

৭। মসনদে আহমদ (ষষ্ঠ খন্ড) পৃষ্ঠা -২৯৯; সহী বুখারী ২য় খন্ড পৃঃ ২৩৯।

৮। সহী বুখারী ঃ নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, ৮ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃকিয়ামতের লক্ষন এবং ফিতনা অধ্যায়, ফিতনা সমা-গত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৯। সহী মুসলিম তাকদীর অধ্যায়, মৃত্যু ও রিজিক নির্ধারিত কিন্তুমাত্র ও এদিক সেদিক হওয়ার উপায় নেই অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

১০। সহী মুসলিম ঃ যিকির ও দোয়া অধ্যায় প্রভাতে ও নিদ্রাকালে দোয়া অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১১। সহী বুখারী ঃ ইতিকাফ অধ্যায়, ইতিকাফ কারীগন কি প্রয়োজনে মসজিদের বাহিরে যেতে পারে অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, স্বামী বা মুহাররমের সাথে দেখতে যাওয়া মহিলার পরিচয় দেয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

১২। সহী মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, যাবতীয় গুনাবলী সহকারে নামায আরম্ভ ও শেষ করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩। সহী বুখারী ঃ রিকাব অধ্যায়, হাউসে কাওছার সম্পর্কিত আল্লাহর বানী অনুচ্ছেদ, ১৪ খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম ফাযায়েলে অধ্যায় হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। সহী বুখারী ঃ ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার ফযিলত চন্দ্র গ্রহন বা অন্য কোন নিদর্শনের সময় দাসমুক্ত করা অনুচ্ছেদ ৬খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১৫। সহী মুসলিম ঃ ফযীলত অধ্যায়, রসূল সঃ এর শরীরের ঘামকে সুগন্ধি ও বরকত হিসেবে গ্রহন, অনুচ্ছেদ,৭খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।

১৬। সহী মুসলিম ঃ জিহাদ ও ভ্রমন অধ্যায়, যুদ্ধজয়ী মহিলাদের জন্য অংশ নির্ধারনের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

১৭। সহী বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, পাহাড়ে পালিত মেষ মুসলমানদের উত্তম সম্পদ অনুচ্ছেদ,৭খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, বিড়ু মেরে ফেলা অনুচ্ছেদ ৭খন্ড ৪২ পৃষ্ঠা।

১৮। সহী মুসলিম ঃ যিকির দোয়া তওবা, ইসতিগফার অধ্যায়, অপমৃত্যু ও নিষ্ঠুর জালেমদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা অনুচ্ছেদ ৮ খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

১৯। সহী মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায় গুনাহর কাজ ছাড়া সমস্ত বিষয়ে নেতার আনুগত্য করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

২০। সহী বুখারী ঃ নিষ্পত্তি অধ্যায়, পরস্পরের বিরোধ নিষ্পত্তি করাতে গিয়ে কিছু বললে সে মিথ্যুক নয় অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ আত্মীয়তা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, মিথ্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা ও যে ক্ষেত্রে তা বলা যেতে পারে সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৮ খন্ড,২৮ পৃষ্ঠা।

২১। সহী বুখারী ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ অধ্যায়, মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ কসর নামায অধ্যায় চাশতের নামাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও তা কম পক্ষে ২ রাকাত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২খন্ড,১৫৮ পৃষ্ঠা।

২২। সহী মুসলিম ঃ ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত অধ্যায়। দাজ্জালের আগমন ও যে স্থান থেকে তা ঘটতে অনুচ্ছেদ ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

২৩। সহী মুসলিম ঃ জুমআর নামায অধ্যায়, খুতবা ও নামায সংক্ষিপ্ত করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

২৪। সহী বুখারী ঃ রোজা অধ্যায়, শিশুদের রোজা অনুচ্ছেদ, ৫খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঃ রোজা অধ্যায়, আশুরার রোজা রেখে খেয়ে ফেললে সম্পূর্ন দিন রোযা রাখার বিবরণ অনুচ্ছেদ ৩ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৪

নারী শিক্ষায় হযরত আয়েশা রাঃ এর অবদান ঃ

উপাধি ঃ হযরত আয়েশা, সিদ্দিকার ইলম সম্পর্কিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে তার পরিচয়টা সংক্ষিপ্তভাবে জানার প্রয়োজন রয়েছে।

''তার প্রকৃত নাম আয়েশা লকব হুমায়রা ও সিদ্দিকা কুনিয়াত উম্মে আবদুল্লাহ এবং খেতাব, উম্মুল মুমিনীন।হুজুরে আকারাম সঃ তাকে বিনতুস সিদ্দিক বলেও সম্বোধন করতেন''[১]

''অবশ্য আসমা উর রিজালের কিতাবসমূহে এবং মাজনাউল বেহার ও নেহায়া প্রভৃতি লোগাতুল হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার লকব হুমায়রা (লাল্যভ গৌরবর্ন) উল্লেখ থাকলেও হাদীসটির টীকায় মুহাদ্দেসীনে কেরাম বলেছেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকার লকব হুমায়রা সমর্থনে কোন প্রমানা রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে কাইয়োম বলেন ''যে সমস্ত হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার লকব হুমায়রা বলে উল্লেখ আছে সেগুলি মউযু হাদীস''[২]

যা হোক হযরত আয়েশা (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন ও সিদ্দিকা লকবেই জগতে অধিক পরিচিত।

জন্ম ও শৈশব ঃ

''হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সঠিক জন্ম তারিখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে ঐহিতাসিকগনকে একমত দেখা যায়। ক) নবী করীম (সাঃ) এর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ছয় বৎসর বয়সে মহানবী সঃ এর সাথে তার বিবাহ হয়।

খ) ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ৯বৎসর বয়সে তিনি স্বামীগৃহে গমন করেন, গ) একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি বিধবা হন। এ সমস্ত বিষয় হিসাব করলে দেখা যায়, হযরত আয়েশার জন্ম হযরত রাসূল সঃ এর নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ম বর্ষের শেষের দিকে হবে। অর্থাৎ হিজরতের ৯বৎসর পূর্বে শাওয়াল মাস। মোতাবেক ৬১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি জন্ম গ্রহন করেন।[৩]'' । সিদ্দিকে আকবর হযরত আবূ বকর রাঃ এর আবাস গৃহই সমগ্র আরব দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান । কেননা ইসলামের আলো সর্বপ্রথম তার গৃহেই প্রবেশ করেছিল। এ কারনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে অন্যতম যাদের কানে কখনও শিরক ও কুফরীর আওয়ায পৌঁছে নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন, ''আমি যখন হতে আমার পিতামাতাকে চিনেছি, তখন হতেই আমি তা'দিগকে মুসলমান রূপে পেয়েছি।''[৪]

আরবের চিরন্তন প্রথা ছিল যে, সম্ভ্রান্ত ও কুলীন ঘরের মহিলাগন নিজেদের গর্ভজাত শিশুদিগকে স্তন্য দান করতেন না। বিনিময় প্রদানে ধাত্রী নিযুক্ত করে শিশুদিগকে তাদের দুগ্ধপান করতেন। তদ্রূপ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ কে হযরত ওয়ায়োলের স্ত্রী দুগ্ধ পান করেয়োছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারন ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকগন শৈশব হতেই নিজেদের প্রত্যেক কার্যকলাপে এবং গতিবিধিতে অসাধারনত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাদের প্রত্যেকটি কথায় ও কাজে আকর্ষন বিদ্যমান থাকে। তাদের ভাগ্য ললাটে ভবিষ্যতোন্নতির আলো ধৃতপ্রতিভাত হয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে থাকে। হযরত আয়েশা রাঃ এই শ্রেনীর লোকদের অন্যতম ছিলেন। শৈশব হতে তার প্রত্যেকটি গতি বিধি ও চালচলন হতে সৌভাগ্য এবং উচ্চ মর্যাদার লক্ষনসমূহ সুস্পষ্ট রুপে প্রতীয়মান হত। তথাপি শিশু শিশুই, খেলাধূলাই তার কাম্য। খেলা আর খেলা ইহা তার বয়স সুলভ স্বভাব। হযরত আয়েশার বাল্যকালে খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক ছিল বেশী। নহল্লার বালিকারা সর্বদা তার কাছে এসে ভীড় জমাত। কিন্তু এ শিশসুলভ চপলতা এবং খেলাধূলার ভিতর দিয়েও রাসুল সঃ এর আদব রক্ষার প্রতি তার তীক্ষ লক্ষ্য থাকত। যাবতীয় খেলাধূলার মধ্যে পুতুল খেলা এবং দোলনায় চড়ে দোল খাওয়া তার বেশী প্রিয় ছিল। (আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা দোলনায় চড়ে সাধারন ছেলেমেয়েদের ন্যায় ছড়াগান গাইতেন না। তিনি দোলার তালে তালে মধুর স্বরে কুরআন শরীয়তের আয়াত আবৃতি করতেন এবং আরবী ছন্দে কুরআন পাকের বহু আয়াত মুখস্থ করে ফেলতেন। একদিন তিনি তার পিতাকে তেলওয়াত করতে শুনলেন।

بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر (سورة القمر)

অর্থাৎ বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে। আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্ত। আয়াতটিতে তিনি এক নতুন ছন্দের সন্ধান পেলেন। পরক্ষনেই তিনি দোলার তালে তালে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। অনুরুপভাবে তিনি আর একদিন পিতাকে কবিদের নিম্নোক্ত বয়েতটি আবৃত্তি করতে শুনলেন-

পরক্ষনেই হযরত আয়েশা দোলনায় চড়ে সেই বয়েতটি দোলার তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘর হতে বের হয়ে দোলনার কাছ দিয়ে যাবার সময় তা শুনতে পেলেন। মনের আনন্দে তিনি দৌড়ে এসে কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন। এবং হেসে বললেন মা ঘরে যাও। অতঃপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নিজ কর্মপথে চলে গেলেন। মনে মনে বললেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমার নয়নমনি এই কন্যাটি ভবিষ্যতে একজন খ্যাতি সম্পন্ন বিদূষী হবে। ইহা আল্লাহ তোমার দরবারে লাখ লাখ শোকর যে তুমি ইহাকে অসাধারন স্মরন শক্তি দান করেছ।

উক্ত ঘটনা থেকে বাল্যকাল হতে সতিাই তার প্রখর স্মরন শক্তির প্রমান পাওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার পর হতে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহন করেন তাদের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা ও সতের জন পুরুষ লেখাপড়া জানতেন। মহিলাটি হল বনী আদী গোত্রের হযরত শেফা বিনতে আবদুল্লাহ, ইনি পরবর্তীকালে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা ও হজরত হাফসা (রাঃ) এর শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। আর পুরুষদের মধ্যে লেখাপড়া এবং শিক্ষা দীক্ষায় হযরত আবু বকরই (রাঃ) ছিলেন সর্বপ্রধান। (নাসায়ী ও মুসলিম)।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রাঃ) তার অতি আদরের কন্যাকে শুধু ধর্ম সম্পর্কীয় আহকাম অর্থাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বাল্যকাল হতেই হযরত আয়েশা (রাঃ) কে চালচলন, আচার ব্যবহার, আদব কায়দা সাফ-সাফায়ী দান খয়রাত মেহমানদারী এবং সত্যবাদিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফল কথা তাকে সর্বগুনে আদর্শ স্থানীয় করে তোলার জন্য তার পিতা বিন্দু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি সর্বদা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে কুরআন শরীফের এ আয়াতটি শুনিয়ে নসীহত করতেন।

হযরত আয়েশা রাঃ এর স্মরন শক্তি ও জ্ঞানের ভান্ডার যে এত অফুরন্ত ছিল তার প্রমান আমরা নানাভাবে পাই। উল্লেখ থাকে যে, কিতাবুল মুলক ওয়া আখবারুল মাদায়েন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, —

''উমাইয়া বংশের আমীর মোঁআবিয়া রাঃ স্বীয় রাজত্বকালে আরব দেশের প্রাচীন রাজা ও রাজাসমূহ সম্বন্ধে একটি ইতিহাস গ্রন্থ লিখতে মনস্থ করলে, উহার উপকরন সংগ্রহ করার জন্য লেখকগনকে হযরত আয়েশার নিকট প্রেরন করেছিলেন।''

তালিম ও তরবিয়াত ঃ

তৎকালে আরবে পুরুষদের মধ্যেই লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। নারীরা আবার লেখাপড়া করবে কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সে সময়ে কুরাইশ সম্প্রদায়ে মাত্র ১৭জন পুরুষ এবং একজন মহিলা লেখাপড়া জানত। তাহলে এখানেই বুঝতে পারা যাচ্ছে শিক্ষার দিক থেকে নারীরা কতটা অনগ্রসর ছিল।

হুজুর আকরাম (সাঃ) এর বহু বিবাহে বিশেষ করে ৫৩ বৎসর বয়সে ৬বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করার মধ্যে বহু হেকমত ও মূল্যবান উপদেশ নিহিত ছিল। তন্মধ্যে একটি প্রধান হেকমত ছিল যে, পুরুষগন সর্বদা হুজুরের খেদমতে হাজির থেকে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের ফলে শিক্ষা দীক্ষায় সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করত। কিন্তু মহিলাগনের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিনা বিবাহে হুজুরের সংসর্গ লাভ সম্ভব ছিল না, কাজেই তারা এ মহাসৌভাগ্য হতে বঞ্চিত ছিলেন। বহুবিবাহ ব্যতীত নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চার বিস্তার সম্ভব ছিল না। যেহেতু প্রবাদে আছে -

العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر ০

অর্থাৎ বাল্যকালের শিক্ষা পাথরে দাগ কাটার ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে থাকে। এ জন্য অন্ততঃপক্ষে এ শিক্ষার্থী দলে একজন মেধাবী বালিকারও প্রয়োজন ছিল।

হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর পবিত্র ও সাধবী বিবিগনের মধ্যে হযরত হাফসা ও উম্মে সালমা রাঃ লেখাপড়া জানতেন। হযরত হাফসাই হুজুর (দঃ) এর নির্দেশে শেফা বিনতে আবদুল্লাহ আদাবিয়্যাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় মহিলা সাহাবী কিছু কিছু লেখাপড়া জানতেন।

(মুসনাকে আহমদ ইবনে হাম্বল) ফলে কেবল মা হুজুরের পবিত্র বিবিগনই এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেলেন। অতঃপর ধর্মীয় জ্ঞান আকাশের নক্ষত্ররাজির সাহায্যেই সমগ্র মহিলাজগত ধর্মীয় আলোকে আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। লেখাপড়া হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক তালীম। প্রকৃত তালীম এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে মানবতার বিষয়সমূহের জ্ঞানার্জন। শরীয়তের বিধানগুলির গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

কালানুল্লাহ শরীফের মর্মার্থ ও তাৎপর্য অবগত হওয়া এবং নবী সাঃ এর হুকুম আহ্কাম সম্বন্ধে পূর্ন জ্ঞান লাভ করাই প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ পর্যায়ের তালীম। হুজুর সঃ এর কাছ হতে তিনি যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক উভয়বিধ জ্ঞানই লাভ করেছিলেন। ইতঃপুর্বে পিতার গৃহে তিনি যে তালীম পেয়ে ছিলেন তা ছিল অসম্পূর্ন। সেটা সম্পূর্নতা লাভ করে নবী করীম সঃ এর কাছে এসে।তাই বলা যায় হুজুর সঃ এর প্রদত্ত তালীমও তরবিয়াতের মাধ্যমে হযরত আয়েশা রাঃ অগাধ জ্ঞানের অধিকারিনী হয়েছিলেন। এ জন্য ইসলামে হযরত আয়েশা রাঃ যত দান, অবদান এর মূলে রয়েছে হুজুর সঃ এর হতে পাওয়া তালীম ও তরবীয়ত। পূর্বেই যা উল্লেখ করা হয়েছে —

ধর্মীয় বিষয়ের বিভিন্ন শাখা ছাড়াও তিনি ইতিহাস এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সাহিত্য এবং ইতিহাস তো তিনি নিজের সুবিজ্ঞ পিতার কাছ থেকে শৈশব কালেই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর দেশ বিদেশ হতে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ মসজিদে নব্বীতে বসে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা করতেন। মসজিদ সংলগ্ন হুজুরায় বসে হযরত আয়েশা রাঃ তা শ্রবন করতেন। এতদ্ভিন্ন হুজুরে আকরাম (সঃ) শেষ জীবনে প্রায়ই নানা প্রকার রোগে ভুগতেন আরবের বিচক্ষন ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগন এসে তার রোগের যে সমস্ত ব্যবস্থা পত্র প্রদান করতেন হযরত আয়েশা রাঃ তা কান পেতে শুনতেন এবং স্মরন রাখতেন। এ রূপে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিচক্ষন জ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন। (মুসনাদে ইবনে হাম্বল)

দ্বীনি এলম শিক্ষার জন্যও হযরত আয়েশা রাঃ এর কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত ছিল না। শরীয়তের মুয়াল্লিম স্বয়ং হযরত পয়গম্বর (সাঃ) কে তিনি সর্বদা নিজের কাছে পেতেন এজন্য দিবারাত্র সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য তার ছিল। হুজুর সাঃ প্রত্যেক দিনই মসজিদে নব্বীতে সাধারন সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এর মজলিসে ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াস নসীহত করতেন। হযরত আয়েশা রাঃ এর হুজুরা মোবারক মসজিদের সংলগ্ন থাকায় হুজুরায় বাইরে হুজুর সঃ ধর্মীয় তালীমের জন্য যে সমস্ত মজলিস অনুষ্ঠান করতেন হযরত আয়েশা রাঃ তাতেও অংশ গ্রহনের সুযোগ পেতেন। কোন কথা বুঝতে না পারলে হুজুর সঃ অন্দরে তশরীফ আনা মাত্র সে সমস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ দূর করে নিতেন। (মুসনাদে আহমদ)

ইহা ছাড়াও পবিত্র বিবিগনের অনুরোধে প্রতি বৃহস্পতিবার নবী সাঃ নিজের অন্দর মহলে ধর্ম সম্বন্ধে ওয়ায করে বিবিগনকে শুনাতেন।জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ থেকে বুঝা যায় নারী শিক্ষায় তারা কতটা আগ্রহী ছিলেন। আসল কথা তৎকালীন আরবে নবী করীম সাঃ এর পত্নীগন জ্ঞান চর্চায় সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেগেছেন।) হযরত আয়েশা রাঃ তাহাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবন করতেন এবং উত্তম ভাবে স্মরন রাখতেন। বোখারী। আল্লাহতায়ালা নবীর বিবিগনকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশ প্রদান করেছেন-

"আর হে নবী পত্নীগন স্মরন রেখ, আল্লাহতালার আয়াত সমূহ এবং হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান হতে যা কিছু তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সূক্ষদর্শী এবং জ্ঞানময়।" হযরত আয়েশা রাঃ আল্লাহ পাকের এ পবিত্র আদেশটিকে তিনি নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন, অর্থ সম্পদ এবং জ্ঞান সম্পদ এ দুটি বস্তু মানুষকে কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

এতদভিন্ন হযরত আয়েশা রাঃ এর অভ্যাস ছিল যে, যে কোন বিষয়ে মনে খটকা লাগত তৎসম্পর্কে নিঃসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে হযরত রাসূল (সঃ) কে প্রশ্ন করতেন এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে পুর্ন তৃপ্তি লাভ না করা পর্যন্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেই থাকতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে প্রদান করতেন। অনুরুপ প্রশ্নোত্তরের একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করছি। একদিন হুজুর সঃ এর উপদেশ প্রসংগে বর্ণনা করলেন-

''কিয়ামতের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে যার আমলের হিসাব নেয়া হবে। সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।'' হযরত আয়েশা রাঃ আরয করলেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহতায়ালা তো ফরমাইয়াছেন-

"فسوف يحاسب حسابا يسيرا"

"তার কাছ হতে খুব সহজ হিসাব নেয়া হবে।"

রাসুল সঃ বললেন ইহা তো আল্লাহতায়ালার দরবারে আমল নামাসমূহ পেশ হওয়ার কথা। এভাবে তিনি সঠিক তথা বিশ্লেষনের জন্য বারবার প্রশ্ন করে জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। যা জগতের নারীদের জন্য শিক্ষা হয়ে আছে।

এলম ও গুনগরিমা ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বিদ্যা বুদ্ধিতে শুধু সাধারন নারীকুল, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না বরং কয়েকজন বুযুর্গ সাহাবী ব্যতীত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে জ্ঞানী ও গুনবতী ছিলেন।সহীহ তিরমিযী শরীফে এ বিষয়ে হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাঃ এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীবৃন্দ কখনও এমন কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। যা সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাঃ এর কাছে জিজ্ঞাসা করে আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারি নাই। (বরং প্রত্যেক সমস্যার সমাধানই তার কাছে পেতাম। তাবেঈ আতা ইবনে আবী রাবাহ যিনি বহু সাহাবায়ে কেরামের শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন-

كانت عائشة افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامة

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ লোকদের মধ্যে ফেকাহ শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী । সর্বাপেক্ষা বড় আলেম এবং সাধারন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহনকারিনী ছিলেন।

তাবেঈনদের অগ্রনায়ক ইমাম যুহরী যিনি প্রধান প্রধান সাহাবায়ে কেরামের কাছে তালীম ও তরবিয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন — كانت عائشة اعلم الناس يسئلها الاكابر من اصحاب رسول الله (ص) -

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। হুজুর সঃ এর প্রধান প্রধান সাহবীগন তার কাছে এসে বহু জটিল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। আমীর মোআবিয়া (রাঃ) একদিন তার জনৈক সভাসদকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বড় আলেম কে? তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন আপনি। হযরত মোআবিয়া রাঃ বললেন না আমি নই। আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি সত্য সত্য বল। লোকটি বললেন তা হলে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ।

রাসূল সাঃ এর হাওয়ারী (সহচর) যোবায়ার রাঃ এর কলিজার টুকরা হযরত ওরওয়া রাঃ বলেন-

ما رأيت احدًا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة او المؤمنين رضى الله عنها -

"আমি হালাল, হারাম, এলম শায়েরী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আর কাউকেই দেখি নাই।" মাসরুক নামক বিখ্যাত তাবেঈই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাঃ হতে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেহ তাকে জিজ্ঞাসা করল উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ ফারায়েয শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন কি? হযরত মাসরুক রাঃ -উত্তর করলেন,-

"হাঁ সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রধান প্রধান সাহাবীগনকে হযরত আয়েশা রাঃ এর কাছে ফারায়েযের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি।"

কোন এক মুহাদ্দেস হযরত আয়েশা রাঃ এর ফজীলত সম্বন্ধে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সঃ বলেছেন-

خذوا شطر دينكم عن حميراء

"তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের একাংশটি ঐ গৌর বর্না স্ত্রী লোকটির নিকট হতে (আয়েশা রাঃ) শিক্ষা কর।"

তাহলে উপরোক্ত বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেঈদের সাক্ষ্য প্রমান মূলক উক্তি থেকে বুঝা - যাচ্ছে হজরত আয়েশা রাঃ এর জ্ঞানের পরিধি কত বেশী এবং বিস্তৃত ছিল।

হযরত আয়েশা রাঃ এর ইলম এবং ইজতেহাদ ঃ

হযরত আয়েশা রাঃ শুধু নারী জাতির মধ্যেই নহে, বরং পুরুষ জাতির মধ্যেও শীর্ষ স্থানীয় বলে গনা হয়ে থাকেন। কুরআন পাক, হাদীস শরীফ, ফেকাহশাস্ত্র এবং আহকামে দ্বীন সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তার মর্যাদা এত উচ্চ যে, বিনা দ্বিধায় তাকে হযরত ওমর ফারুক, হযরত আলী মুরতাযা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সমাসীন বলা যেতে পারে।

কুরআন মজীদের জ্ঞান ঃ

সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি কুরআনে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি পরম সৌভাগ্যবতী ছিলেন। কারন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ হুজরা ও বিছানা ব্যতীত অন্য কোন উম্মুল মুমিনীনের ঘরে বা বিছানায় ওহী নাযিল হয় নাই। যা হোক, ওহী হযরত আয়েশা রাঃ এর

Dhaka University Institutional Repository

গৃহে নাযিল হওয়াকালে ওহীর আওয়াজ সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাঃ এর কানে আসত। তিনি স্বয়ং বলেন, আমার হুজরায় সূরা বাকারা ও সূরা নেসা নাযিল হওয়ার সময় আমি তার পার্শ্বে ছিলাম। ফলতঃ কুরআন শরীফ এর আয়াত সমূহ কিভাবে পঠিত হয়েছে, হুজুর সাঃ সেগুলির ব্যাখ্যা কিরুপ প্রদান করেছেন, বাস্তব জীবনে সেগুলিকে প্রতিফলিত করার উপায় হুজুর সাঃ কিরুপ বলে দিয়েছেন, কি উপলক্ষে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, যাবতীয় বিষয় হযরত আয়েশা রাঃ এর জানার সুযোগ ঘটেছে। তাফসীর বিষয়ে —— তার এত জ্ঞান ছিল যে, কুরআন এর আয়াতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি করতে পারতেন। নিম্নের কতগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়। ১। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করা, হজ্জের করনীয় ক্রিয়াসমূহের একটি। কুরআনে শরীফে আছে -

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহতা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে, ব্যক্তি খানায়ে কাবার হজ্জ করে কিংবা ওমরা পালন করে তখন এ পাহাড়দ্বয়ের সায়ী করাতে কোন দোষ নেই।

এ আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানবার জন্য একদিন হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়র রাঃ হযরত আয়েশা রাঃ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, খালা আম্মা! এ আয়াতটি হতে ইহাই তো বুঝা যায় যে হজ্জ বা ওমরা করাকালে কেহ যদি এ পাহাড়দ্বয়ের তওয়াফ না করে তবুও হজ্জ এবং ওমরার কোন ক্ষতি হবে না। হযরত উম্মুল মুমিনীন বললেন, না বৎস! তুমি ঠিক বল নাই। আয়াতটির মমার্থ তুমি যা বুঝেছ। যদি আয়াতের মতলব তা হত তবে আল্লাহ তায়ালা এরুপ বলতেন। —

لا جناح عليه ان لا يطوف بهما

অর্থাৎ এ পাহাড়দ্বয়ের তওয়াফ না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। বস্তুত এ আয়াত টি আনসার সম্প্রদায় সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহনের পুর্বে হজ্জের মওসুমে এ স্থানে এসে বলত, মানাত প্রতিমার জয়। কেননা মানাত মূর্তিটি তৎকালে এখানে একটি উচ্চ প্রস্তরের মাথায় স্থাপিত ছিল। এ কারনে উক্ত আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহনের পর এ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে হজ্জের সময় সায়ী করাকে জাহিলিয়াতের কাজের অনুকরন বলে খারাপ মনে করতেন। সুতরাং রাসুল সাঃ এর খেদমতে এসে আরয করলেন, আমরা ইসলামের পুর্বে এরুপ করতাম। এখন কি করব? এ প্রশ্নের পর আল্লাহতায়ালা ওহী প্রেরন করলেন, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের তওয়াফ কর । এতে ক্ষতির কোন কারন নাই। অতঃপর হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, ধরং হুজুর আকরাম সাঃ যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের সায়ী করেছেন, এরপর এ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করার অধিকার কারও নেই। অতএব বুঝতে হবে যে,হজ্জ বা ওমরার জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থানে সায়ী করা অন্যতম ফরজ বা অবশ্য করনীয় কাজ। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান হযরত আয়েশা রাঃ এর এই তাফসীর অবগত হয়ে বললেন একেই বলে ইলম। এরই নাম সূক্ষ্ম জ্ঞান। বস্তুত অল্প কয়েকটি বাক্যের দ্বারা হযরত আয়েশা রাঃ তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি সম্বন্ধীয় একটি জটিল সমস্যার সমাধা করে দিলেন। কুরআন শরীফের তাফসীর করার সময় প্রত্যেক মুফাসসেরকে এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হবে যে, আরবের কথা ও প্রচলিত ভাষা অনুসারে কুরআন শরীফের শব্দসমূহ হতে যে অর্থ বুঝা যায়, উহাকেই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য মনে করতে হবে। যেমন- হযরত আয়েশা রাঃ বলেছেন, হে ওরওয়া! তুমি এ আয়াতের মমার্থ যা বুঝেছ যদি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য তাহা হত, তবে তিনি আরবের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী —

لا جناح عليه ان لا يطوف بهما

দুই পাহাড়ের তওয়াফ না করলে কোন দোষ নেই।'' বলতেন, তাতে তুমি যে অর্থ বুঝেছ, তা আরও পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে যেত।

২। স্বামী স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আয়াতটি।

وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا
جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

অর্থাৎ কোন নারী যদি স্বীয় স্বামীর তরফ হতে অসন্তুষ্টি কিংবা বিরুপ ভাবের আশংকা করে, তবে উভয়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে নেয়াতে কোন ক্ষতি নাই। আপোষ মীমাংসা সকল অবস্থায়ই মঙ্গলজনক।

জনৈক ছাত্র এ আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হযরত আয়েশা রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পরস্পরের মনের কালিমা ও অসন্তোষ দূর করার জন্য আপোষ মীমাংসা করে নেয়া যে মঙ্গলজনক ইহা তো দিবালোকের মত স্পষ্ট। এ প্রসংগে আল্লাহতায়ালার এ বিশেষ বিধান নাযিল করার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরে হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, এ আয়াতটি যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যার স্বামী তার কাছে বেশী আসা যাওয়া করে না। স্ত্রী বার্ধক্যবশতঃ স্বামীর খেদমত করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এ বিশেষ অবস্থায় যদি বিধি তালাক গ্রহন করা পছন্দ না করে এবং স্ত্রীরুপে থেকে স্বামীকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দেয়। তবে এ পারস্পারিক আপোষ মীমাংসার মন্দ নহে। বরং সম্পূর্ন রুপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হতে এ প্রকারের আপোষ মীমাংসা মঙ্গলজনক। কুরআন মজীদের মধ্যে যেখানেই কোন ভয়ংকর দৃশ্য কিংবা ভয় ও বিভীষিকার উল্লেখ আছে, মুফাসসেরগনের সাধারন নিয়ম এই যে, তারা ঐ সমস্ত ভয়ংকর দৃশ্য বা ভয় বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু কুরআন শরীফ এর প্রত্যেকটি আয়াতের প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং সঠিক পন্থায় তার উপর প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে পারতেন। কুরআন শরীফ এর একটি আয়াতের অংশ।

يوم تاتي السماء بدخان مبين

অর্থাৎ ''যে দিন আসমান ধুম্রায়মান হয়ে যাবে।''

এখানে কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্যের কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, হিজরতের পূর্বে হযরত নবী করীম সাঃ বদদো'আর ফলে যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আরব দেশকে গ্রাস করেছিল। এ আয়াতটি সে দৃশ্যই বর্ণনা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তিনি পবিত্র কুর'আনের আয়াতের তাফসীর তার প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তিগত জ্ঞান দ্বারা করে নারী জাতির শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করে গেছেন। তিনি জানিয়ে গেছেন নারীদের কোন জ্ঞান অর্জন করা নিষেধ নয়।

হাদীস ঃ

উম্মুহাতুল মুমিনীন অর্থাৎ হুজুরের আযওয়াজে মুতাহহারাত হুজুরের সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে থেকে অপরাপর সকলের চেয়ে তার জীবনাদর্শ ও প্রাত্যহিক কার্যাবলী সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাই কুরআনের মত হাদীস শাস্ত্রেও তার অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত হাদীস সমূহের সংখ্যা এত অধিক যে, শুধু উম্মাহাতুল মুমিনীন বা সাধারন মহিলা সাহাবীগন কেন, পুরুষ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও চার খলিফা ব্যতীত আর কেহই হাদীসের জ্ঞান বিষয়ে তার সমকক্ষতার দাবী করতে পারতেন না।

উল্লেখ্য যে, অল্প বয়স্ক সাহাবীগনের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসসমূহের দ্বারাই হাদীস গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ন রয়েছে। প্রধান ও প্রবীন সাহাবায়ে কেরাম হতে হাদীস কম রেওয়ায়েত হওয়ার ইহাই রহস্য। যে সমস্ত অল্প বয়স্ক সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা সহস্রাধিক তাদের সংখ্যা মাত্র সাত। তাদের নাম ও রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল।

নাম	রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা
হযরত আবু হুরায়রা রাঃ	৫,৩৬৪
হযরত ইবনে আববাস রাঃ	২,৬৬০
হযরত ইবনে ওমর রাঃ	২,৬৩০
হযরত জাবের রাঃ	২,৫৪০
হযরত আনাস রাঃ	২,২৮৬
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ	২,২১০
হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ	২,১৭০

Dhaka University Institutional Repository

অধিক সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাঃ এর স্থান ষষ্ঠ। যাদের নাম তার উপরে তাদের মধ্যে অনেকেই হযরত আয়েশা রাঃ এর ইন্তেকালের পরেও জীবিত ছিলেন এবং তাদের হাদীস বর্ণনার সিলসিলা আরও কয়েক বৎসর প্রচলিত ছিল। কাজেই তাদের বর্নিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আয়েশা রাঃ এর চেয়ে অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

উপরে বর্ণিত ফিরিস্তি হতে জানা যাচ্ছে যে, হযরত আয়েশা রাঃ হতে রেওয়ায়েতকৃত হাদীসসমূহের মোট সংখ্যা ২,২১০। তন্মধ্যে হতে ২৮৬টি হাদীস সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৪টি হাদীস উভয় কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। অবশিষ্ট ১১২টি হাদীসের মধ্যে ৫২টি হাদীস শুধু বোখারী এবং ৫৮ হাদীস মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। এ হিসাবে দেখা যায় হযরত আয়েশা রাঃ কতৃর্ক রেওয়ায়েত কৃত হাদীসসমূহের মধ্যে ২২৮টি হাদীস বোখারী শরীফে এবং ২৩২টি হাদীসে মুসলিম শরীফে রয়েছে। আর অবশিষ্ট হাদীসগুলি অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্নিত হয়েছে।ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ তার মুসনাদ গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ডে কেবল হযরত আয়েশা রাঃ কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থটি মিসরী টাইপের ছোট অক্ষরে ছাপা হলেও হযরত আয়েশা রাঃ এর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসগুলি উহার ২৫২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু হযরত আয়েশা রাঃ এর হাদীসগুলিকে পৃথকভাবে একস্থানে একত্রিত করলে একটি স্বতন্ত্র ও বিরাটকায় হাদীসের কিতাব হয়ে যাবে।

হিজরী ১০১সনে উমাইয়্যা খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাঃ রেওয়ায়েত-কৃত হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়।

অধিক সংখ্যায় হাদীস রেওয়ায়াতের সাথে সাথে মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষমতা ছাড়াও হযরত আয়েশা রাঃ এর রেওয়ায়েত সমূহের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইহাও রয়েছে যে, তিনি যেসমস্ত বিধান এবং ঘটনাবলী বর্ণনা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহাদের উৎস এবং কারণ গুলিও বর্ণনা করেছেন। কোন বিশেষ হুকুম যেসমস্ত যুক্তি ও মসলেহাতের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে তিনি বিশদভাবে সে সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আয়েশা রাঃ এ তিন জনের রেওয়ায়তই পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়েছে যে, জুমআর দিনে নামাযের পূর্বে গোসল করা উচিত। নিম্নে তিনজনের রেওয়ায়তই উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ রেওয়ায়ত করেছেন-

سمعت رسول الله (ص) يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل.

অর্থাৎ আমি হযরত রাসূল সঃ কে বলতে শুনেছি ''যে ব্যক্তি জুমার নামাযে আসে। তার গোসল করে আসা উচিত।'' (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ বলেন-

ان رسول الله (ص) قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ''হুজুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন- জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেক বালেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব।''

ঠিক এই মাস'আলাটিই হযরত আয়েশা রাঃ এ ভাষায় রেওয়ায়েত করেছেন-
''মদীনা নগরীর লোকেরা নিজ নিজ গৃহ হতে এবং মদীনা শহরের বহির্ভাগস্থ বস্তি সমূহ হতে ধুলাবালি মিশ্রিত ঘর্মাক্ত দেহে আসত। একবার তাদের একজন হুযুরেসাঃ নিকট আসল। তখন হুজুর আমার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, তোমরা এ পবিত্র দিনটিতে গোসল করে আসলে ভাল হত।'' (বোখারী শরীফ)

ফিকহ ও কিয়াস ঃ

ফিকহ শাস্ত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ-এর মর্যাদা এবং জ্ঞানের গভীরতা কত অপরিসীম ছিল তা সবারই জানা।

নবী (সাঃ)-এর আমলে স্বয়ং তিনিই ছিলেন ইলম এবং ফতওয়ার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। এ পবিত্র যমানা অতীত হওয়ার পর শরীয়তের গুরুত্ব জ্ঞানী ও ইসলামী বিধানসমূহের বিশারদ প্রধান প্রধান সাহাবীগণ তার স্থলবর্তী হলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের সম্মুখে কোন নতুন মাস'আলা উপস্থিত হলে তারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার আলেমগণকে সমবেত করতঃ তাদের সংগে পরামর্শ করতেন। তাদের মধ্যে কারও কোন বিশেষ হাদীস জানা থাকলে তারা তা বর্ণনা করতেন। অন্যথায় কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুরূপ কোন মাস'আলার সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে কিয়াস দ্বারা সে নতুন মাস'আলার ফায়সালা করতেন। এরপর বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রধান প্রধান সাহাবীগণ মদিনা হতে স্থানান্তরে গমন করার পর মদীনা শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবুহুরায়রা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ-এ চার জন মহামানবই ফেকাহ ও ফতওয়া প্রদানকারী দায়িত্ববান ব্যক্তিত্বের আসনে সমাসীন থাকেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, বক্তৃতা এবং কাব্যশাস্ত্রে হযরত আয়েশা রাঃ)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর শাগরেদ বলেনঃ- ইতিহাস, সাহিত্য বক্তৃতা এবং কাব্য শাস্ত্রে উম্মুল মু'মিনীন বিশেষ বিজ্ঞ ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্না ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ

হিশাম ইবনে ওয়াওয়া বলেন অর্থাৎ "আমি কুরআন, ফারায়েয হালাল, হারাম অর্থাৎ ফেকাহ, কাব্য আরব দেশের ইতিহাস এর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকেও দেখি নাই।

বলা বাহুল্য, তৎকালে আরব দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের যথারীতি প্রচলন ছিল না। তৎকালে আরব দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ ছিলেন হারেস ইবনে কালদাহা। দেশে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত আরও ছোট ছোট অনেক চিকিৎসক ছিলেন। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি এরূপই ছিল, যেরূপ অজ্ঞ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রচলিত থাকে। হয়তো কিছু বনজ লতাপাতার গুণাগুণ এবং নানাবিধ রোগের কিছু প্রসিদ্ধ ও পরীক্ষিত ঔষধের নাম জানা থাকত। এ সংকটময় মুহূর্তে হযরত আয়েশা রাঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান দিয়ে মানুষের অনেক উপকার করেন।

একদিন হযরত আয়েশা রাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি আবু বকরের কন্যা কবিতা রচনা করেন ভাল কথা। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের এ অগাধ জ্ঞান অর্জন করলেন কিভাবে? তিনি উত্তর করলেন হুযুরে আকরাম (সঃ) শেষ বয়সে প্রায় অসুস্থ থাকতেন, আরবের চিকিৎসকগণ তার চিকিৎসার জন্য আসতেন, তারা যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতেন তা আমি স্মরণ করতাম। ---- মুস্তাদরাক।

উম্মুল মু'মেনীন হযরত আশেয়া রাঃ গ্রন্থের লেখক মাওলানা নুরুর রহমান বলেছেন-- চিকিৎসা শাস্ত্রে হযরত আশেয়া রাঃ-এর জ্ঞান প্রাচীনকালের বর্ষীয়সী বৃদ্ধা রমনীদের ন্যায় ছিল। যারা পরিবারের শিশুদের টোটকা চিকিৎসা করত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রোগেরও পরীক্ষিত কিছু ব্যবস্থাপত্র স্মরণ রাখত। মুসলিম মহিলারা সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে হুযুর সাঃ-এর সংগে যেতেন এবং আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিতেন। হযরত আয়েশা রাঃও ওহুদের যুদ্ধে আহত মুজাহিদগণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এতে বুঝা যায়, সেকালের মুসলিম মহিলাগণ এ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখতেন।

ইতিহাস ঃ

আরব জাতির অবস্থা, অজ্ঞ যুগের প্রচলিত রীতিনীতি এবং সম্প্রদায়সমূহের পারস্পারিক বংশ সম্পর্কীয় পরিচয় সম্বন্ধে হযরত আবু বকর (রাঃ) পারদর্শী ছিলেন। হযরত আয়েশা রাঃ ছিলেন তার কন্যা। সুতরাংএ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান পুরুষানুক্রমিক মীরাস সূত্রেই তার প্রাপ্য ছিল।

তার অগাধ জ্ঞান দেখেই হযরত ওরওয়া বলেছিলেন —

ما رايت احدا من الناس اعلم بحديث العرب والنسب
من عائشة ٥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ''আমি কাহাকেও আরবের ইতিহাস এবং বংশ পরিচয় সম্বন্ধে হযরত আশেয়া রাঃ-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী দেখতে পাই নাই।''

আরবের অজ্ঞ যুগের রসম বা প্রথা এবং সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আয়েশা রাঃ-এর যবানী বর্ণিত রয়েছে। যেমন, আরব দেশে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠান কিরূপে সম্পাদিত হত, কিরূপে তালাক দেয়া হত, বিবাহ শাদীতে কি ধরনের গান বাজনা হত, তারা কোন্ কোন্ দিনে রোজা রাখত, হজব্রত পালন কালে তারা কোন জায়গায় অবস্থান করত এবং মৃত ব্যক্তিকে দেখলে তারা কি বলত ইত্যাদি। (বোখারী)

মুহাদ্দেসীনের মজলিসে আনসার সম্প্রদায়ের বো'আস যুদ্ধের আলোচনা হযরত আয়েশা রাঃ-এর মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। আনসার সম্প্রদায়ের কোন কোন ধর্মীয় প্রথা যেমন - অজ্ঞ যুগে তারা মুশাল্লালের মুর্তি পূজা করত। ইহাও হযরত আশেয়া রাঃ হতে জানতে পাওয়া যায়। ইসলামের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন,-- হুযুর (রাঃ)-এর উপর ওহীর অবতরণ আরম্ভ হওয়া তথা নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ, হিজরতকালের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা, স্বয়ং তার নিজের প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিস্তারিতভাবে তার মুখ থেকেই শুনতে পাওয়া যায়।

"সিহাহ সিত্তার" কিতাবগুলিতে সংকলিত হাদীস (সাধারণতঃ) দুই তিন সতরের বেশী হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা রাঃ কর্তৃক রেওয়ায়তকৃত উপরোক্ত ঘটনাগুলি সিহাহর কিতাবেই একাধারে দুই-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। কুরআন শরীফ কিরূপে এবং কোন অনুক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামে নামাজের কি কি সুরত বা ধরন পয়দা হয়েছে তা হযরত আয়েশা(রাঃ) ই বর্ণনা করেছেন। ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি যে বিশেষ ভাবে সুখ্যাত ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, নবী করীম (সাঃ)-এর মৃত্যু পীড়ার অবস্থা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাঃ-এর মুখের বর্ণনা হতেই দুনিয়া জানতে পেরেছে। তার কাফনের কয় খন্ড কাপড় দেয়া হয়েছিল এবং কাপড়গুলি কি রকমের ছিল। তা হযরত আশেয়া রাঃ -এর রেওয়ায়ত হতেই জানা গেছে।

এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থাও তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন। বদর যুদ্ধের কোন কোন ঘটনা। ওহুদ যুদ্ধের অবস্থা খন্দক যুদ্ধের অবস্থা, বনু কোরাইযার যুদ্ধের আংশিক ঘটনাবলী, যাতুররেকা যুদ্ধে সালাতুল খাওফের বিবরণ, মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর সাঃ-এর হাতে মহিলাগণের বাইআত, হুদ্দাতুল বেদার ঘটনাবলীর একান্ত প্রয়োজনীয় অংশসমূহ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দ্বারাই দুনিয়া জানতে পেরেছে। হুযুরে আকরাম সাঃ-এর জীবনী আখলাক ও আদাত মোবারক সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত বিবরণ তার কাজ হতে পাওয়া গিয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) পরে হযরত আবু বকর রাঃ এর খেলাফত, হযরত ফাতেমা ও আযওয়াজে মুতাহহারাতের দাবী, হযরত আলীর(রাঃ) মনোবেদনা। আবার বাইআতের সমুদয় বিস্তারিত ঘটনা বিশুদ্ধ রেওয়ায়তের মাধ্যমে তার নিকট হতে জানতে পারা যায়। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ। নিজ আরবের মুর্খ যুগের অবস্থা তিনি কার নিকট হতে জানতে পেরেছেন? একটি হাদীসের সনদ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এ জ্ঞান তিনি তার বুযুর্গ পিতা হযরত আবু বকর রাঃ হতে লাভ করেছিলেন। তার জনৈক শাগরেদ এ সম্বন্ধে তাকে বলেছেন -

''আরবের অজ্ঞ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান দেখে আমি বিস্মিত হই নাই। আমি বলি আপনি যথার্থই আবু বকরের কন্যা।''

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইতিহাস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা-এর এমন জ্ঞান ছিল যা নারী জাতিকে জ্ঞান চর্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

সাহিত্য চর্চা ঃ

সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাঃ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। যা নারী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছে।

বছরাবী এক বাক্যে রেওয়ায়েত করেছেন, উম্মুল মুমিনীন অতিশয় মধুর বক্তা এবং মার্জিত ভাষী ছিলেন। তার জনৈক শাগরেদ মুসা ইবনে তালহা রেওয়ায়েত করেছেন

ما رأيت افصح من عائشة

"আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক মার্জিত ভাষী কাকেও দেখি নাই।" (মুস্তাদরাক)

আহনাফ ইবনে কায়স বলেন —

ما سمعت الكلام من فم مخلوق افخم ولا احسن من عائشة -

"কোন মানুষের মুখের কথাকে বর্ণনা মাধুর্যে এবং গাম্ভীর্যে হযরত আয়েশা রাঃ-এর মুখের কথার চেয়ে উত্তম এবং সুন্দর শুনে নাই।"(মুস্তাদরাকে হাকিম)

হযরত আয়েশা রাঃ সুন্দর ভাষাব্যবহার করতেন। যেমন– ওহী অবতরণ শুরু হওয়া সম্বন্ধীয় হাদীসটিতে যেখানে তিনি বলেছেন যে, প্রথমে হুযুর (সাঃ) সত্য স্বপ্ন দেখতেন। এ সম্বন্ধে হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণিত শব্দ।

فما رأى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح -

"তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা উষার আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত।"

Dhaka University Institutional Repository

হুযুর সাঃ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হত। তখন তার ললাট মোবারকে ঘর্ম বিন্দু দেখা দিত। এ অবস্থাটুকু হযরত আয়েশা রাঃ এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ললাট মোবারকে তখন মুক্তার ঝালক দেখা যেত। - হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মুনাফিক যখন অপবাদ রটিয়েছিল সে মনোবেদনায় এবং পেরেশানী অবস্থায় রাত্রে তার নিদ্রা আসত না। এ কথাটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

ما اكتحل بنوم

অর্থাৎ ''আমি চোখে ঘুমের সুর্মাও লাগাতে পারি নাই।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা রাঃ-এর বাচনিক উম্মে যরা-এর আখলাক সম্বন্ধীয় যে বিবরণ উল্লেখ রয়েছে, উহার এক একটি বাক্যাংশ এবং এক একটি শব্দ আরবের ভাষা লংকারের নিখুঁত নমুনা।

বক্তৃতা ঃ

বক্তৃতা-- শক্তি আরববাসীদের স্বাধীন স্বভাবের প্রাকৃতিক বা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। এ শক্তি তথাকার পুরুষ জাতিকে অতিক্রম করে নারী জাতির মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। ইসলামের প্রাথমিক কয়েক শতাব্দীতে যখন আরবী ভাষা জীবন্ত ছিল, তখন মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় এবং শক্তিশালিনী বহু মহিলা বক্তা অতীত হয়েছেন।

আহমদ ইবনে আবু তাহের (মৃত্যু) ২০৪ হিঃ) 'বালাগাতুন্নেছা' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবে হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ-এরও বহু বক্তৃতা উদ্ধৃত রয়েছে। তারিখে তাবারী কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যে সমস্ত বক্তৃতা উদ্ধৃত হয়েছে যা তিনি জঙ্গে জামালের (উষ্ট্র যুদ্ধের) ময়দানে প্রদান করেছেন।

ইবনে আবদে রবিবাহী তার রচিত 'ইবনুল ফরীদ' নামক কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করেছেন। কয়েকজন মনিষী হযরত আয়েশা রাঃ-এর বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন

আহনাফ ইবেন কায়েস তাবেঈ বসরী সম্ভবত, বসরা নগরীতেই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাঃ এবং তৎকালীন সকল খলীফা ও প্রধান সাহাবায়ে কেরামের বক্তৃতা শ্রবণ করেছি। কিন্তু হযরত আয়েশা রাঃ-এর মুখ হতে যে কথাগুলি বের হত। উহাতে যে মাধুর্য ও উচ্চ ভাব থাকত, তা অন্য কারও কথায় থাকত না।

আল্লামা সোলায়মান নদবী বলেন,- আহনাফ ইবনে কায়েসের এ বর্ণনার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তার এ উক্তিতে কিছুটা বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবও রয়েছে। কেননা, একজন মহিলার বক্তৃতা তা আবার যুদ্ধের ময়দানে। অবশ্যই অসাধারণ ক্রিয়াশীল হবে যা হোক এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) একজন মার্জিত ভাষী বক্তা ছিলেন। হযরত মো' আবিয়া রাঃ বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

আমি আয়েশা রাঃ-এর চেয়ে অধিক স্থান ও সময়োপযোগী বক্তা। মার্জিত ভাষা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্না কোন বক্তা দেখি নাই।

মুসা ইবনে তালহা বলেন–

"হযরত আয়েশা রাঃ-এর চেয়ে অধিক প্রাঞ্জল ও মার্জিত ভাষী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।"

একজন বক্তার জন্য কথার মাধুর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিশুদ্ধতার সংগে সংগে আওয়ায়ে উচ্চতা এবং সুরে ও স্বরে গাম্ভীর্য থাকা একান্ত আবশ্যক। হযরত আয়েশা রাঃ-এর ভাষা ও আওতায় এরূপই ছিল।

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ আছে –

"অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বক্তৃতা করলেন। তিনি উচ্চ আওয়ায বিশিষ্টা ছিলেন। তার স্বর অধিকাংশ লোকের উপরই প্রথম থাকত। তা যেন একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না প্রভাবশালিনী মহিলার স্বর।"

কাব্য ঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কাব্য চর্চাই ছিল আরব দেশের বিদ্যাজগত। একজন আরব দেশীয় কবি নিজের কবিত্বের বাহাদুরী দেখাতে গেলে হয়তো কোন স্থানে আগুন লাগিয়ে দিতেন অথবা কোন স্থানে আবে হায়াত বর্ষণ করতেন। এ গুনটি শুধু পুরষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মহিলাগণও এ গুনের অধিকারিনী ছিল। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও ১০০ বৎসরকাল যাবৎ মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রাঞ্জলা বিদ্যমান ছিল। এ সময় শত শত মহিলা কাব্য রচনায় এমন দক্ষতা রাখতেন যে, আজ পর্যন্ত তাদের কবিতা আরবী কাব্যের অলংকার হয়ে রয়েছে।

হযরত আয়েশা রাঃ সে যুগেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার মহান পিতা হযরত আবু বকর রাঃ আরব দেশে কাব্য ও রচনা শাস্ত্রের রত্নাকর ছিলেন। সুতরাং পিতৃক্রোড়ে থেকেই হযরত আয়েশা (রাঃ) কাব্য ও রচনা শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইমাম বোখারী "আদাবুল মুফরাদে" ওরওয়া হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, কবি কাব ইবনে মালেকের পূর্ণ কাসীদাই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কণ্ঠস্থ ছিল। এক একটি কাসীদায় ন্যূনপক্ষে ৪০টি বয়েত থাকে। জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী করীম (সঃ) কখনও কোন স্থানে কবিতা পাঠ করেছেন কি? হযরত আয়েশা রাঃ বললেন, হাঁ, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কোন কোন বয়েত তিনি পাঠ করতেন। যেমন

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا – ويأتيك بالاخبار لم تزود –

অর্থাৎ "যাকে তুমি পাথেয় দিয়ে পাঠাও নাই সে তোমার কাছে সংবাদ হয়ে আসবে।"

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পঠিত বহু কবিতা উদ্ধৃত রয়েছে। তার ভ্রাতা আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) জন্মভূমির বাইরে কোথাও বিদেশে ইন্তেকাল করেছিলেন। তথা হতে তার লাশ মক্কা মুআয্যমায় এনে দাফন করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা রাঃ অতঃপর কোন এক সময় মক্কা শরীফে আগমন করলে কবরের কাছে গমনপূর্বক জাহেলিয়াত যুগের জনৈক কবি নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন—

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لم يتصدعا
فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

অর্থাৎ আমরা উভয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বাদশাহ জমাইমার মোসাহেবদ্বয়ের মত এক সংগে অবস্থান করলাম। এমন কি লোকেরা বলাবলি করত, ইহারা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।

এছাড়া অন্য একটি কবিতা —

আত্মীয়-স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন ও অসুস্থ অবস্থায় জন্ম ভূমির স্মরণ মাঝে মাঝে তাঁদিগকে বিচলিত করে তুলতঃ হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, জন্মভূমির কথা স্মরণ হলে মনোবেদনায় তারা কবিতা আবৃত্তি করতেন। জ্বরের প্রবল আক্রমন হলে হযরত আবু বকর রাঃ এ কবিতাটি পাঠ করতেন। —

كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله -

"প্রত্যেক মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে থাকে, আর মৃত্যু তার কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"

আনসার সম্প্রদায়ের মহিলাগণ বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানে এ কবিতা আবৃত্তি করতেন। সেটাও হযরত আয়েশার মাধ্যমেই জগত জানতে পেরেছে—

واهدى لها اكبشا تبحبح في المربد
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد

উল্লেখ্য যে, মক্কার পৌত্তলিকতা যখন হুযুর (সঃ)-এর নিন্দাবাদে কবিতা আবৃত্তি করত, তখন মুসলমান কবিগন উহার কিরূপ জবাব দিতেন, তা একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রেই জানতে পারা গেছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, মুসলমান কবিগণকে লক্ষ্য করে হুযুর (সঃ) বললেন, কোরাইশ সম্প্রদায়ের কাফেরদের নিন্দাবাদে কবিতা লিখ।

এভাবে তিনি কবিতা চর্চার মাধ্যমে নারী শিক্ষাকে অগ্রসর করার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা রাঃ-এর শিক্ষকতা ঃ

হুযুর সঃ-এর নির্দেশ ছিল–

فليبلغ الشاهد الغائب

"যারা আমার মজলিসে উপস্থিত থাকে, তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথাগুলি পৌঁছাবে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ নবী করীম সঃ-এর এই নির্দেশ কতটুকু পালন করেছিলেন– এখন সে বিষয় আলোচনা করা হবে।

ইলম প্রচার করা এবং অন্যান্য মানুষকে শিক্ষা প্রদান করাকে যারা পুরুষ জাতির নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করে থাকেন, তাদের নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র অন্তঃপুরের এই পবিত্র প্রদীপ শিক্ষা ক্ষেত্রে কেমন সুন্দরভাবে দীপ্তিমান হয়ে আলো বিকিরণ করছে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল মসজিদে নববীর সে কোণ যা নবী করীম (সাঃ)-এর হুজরা শরীফ এবং তার পত্নী বিদুষী মহীয়সী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃএর বাসস্থানের সন্নিকটে ছিল।

বালক-বালিকা আর সে পুরুষেরা, যাদের সংগে আয়েশা রাঃ-এর পর্দা করার প্রয়োজন হত না। সে হুজরার ভিতর এসে শিক্ষা মজলিসে বসত। আর বেগানা পুরুষগণ সে হুজরার দরজায় পর্দা ঝুলান থাকত। আর পর্দার অন্তরালে হুজরার ভিতরে হযরত আয়েশা রাঃ উপবেশন করতেন, লোকে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত তিনি উহার উত্তর দিতেন। কোন কোন সময় কোন বিচার তর্ক ও সমালোচনা শুরু ও শাগরেদগণের মধ্যে ঐ খাস বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকত। আবার কোন কোন সময় তিনি নিজেই কোন বিশেষ মাস'আলায় তর্ক বেধে গেলে বিশদভাবে উহার বর্ণনা করতেন। আর শ্রোতৃবৃন্দ নীরবে বসে তা শ্রবণ করতেন। উম্মুল মুমিনীন স্বীয় শাগরেদগণের ভাষা। বর্ণনা ভংগি এবং উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। একবার বিভিন্ন মায়ের গর্ভজাত তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম, ও ইবনে আবী আতীক তার মহান দরবারে উপস্থিত হলেন। কাশেমের ভাষা পরিষ্কার ছিল না। যের যবর দিতে ভুল করতেন। হযরত আয়েশা রাঃ তার ভুল দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আমার ন্যায় এবং ইবনে আবী আতীকের ন্যায় শুদ্ধ করে কেন কথা বল না। (সহীহ মুসলিম)

এ সমস্ত অনিয়মিত শাগরেদগণ, যারা কখনও কখনও তালীমের মজলিসে অংশ গ্রহণ করতেন। তাদের ছাড়াও তিনি বিভিন্ন গোত্রের বালক-বালিকা এবং শহরের অনাথ শিশুদিগকে নিজের কাছে রেখে স্নেহে প্রতিপালন ও শিক্ষা দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী জাতির জন্য হযরত আয়েশা রাঃ-এর অবদান ঃ

স্ত্রী জাতির জন্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল, তিনি দুনিয়াকে দ্বার্থহীন ভাষায় একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম মহিলা পর্দার অন্তরালে থেকেও শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন এবং ওয়াজ-নসীহত, সমাজ সংস্কারসহ জাতির জন্য মঙ্গলজনক প্রভৃতি কার্যসমাধা করতে পারেন। ফলকথা, ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা দান করেছে এবং নারী জাতির অতীতের অবনত অবস্থাকে যতটুকু উন্নত করে দিয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ-এর জীবনেতিহাস এর বিস্তারিত ও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা বটে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যদি এমন কেহ অতীত হয়ে থাকেন, যিনি মসীহে ইসলাম, উপাধি পাওয়ার অধিকারী এবং মুহাম্মদী যুগের হারুন নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন, তবে আলহামদুলিল্লাহ, মহিলা সাহাবীগণের মধ্যেও উম্মুল মুমিনীন এমন এক মহান সত্তা ছিলেন, যিনি ইসলামের মারইয়াম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত।

মহিলা সাহাবীগণ উম্মুল মুমিনীনের মাধ্যমেই তাদের আবেদন ও বক্তব্য নবী করীম সঃ-এর খেদমতে পৌঁছাতেন। তিনি এ সমস্ত ব্যাপারে যতটুকু তার দ্বারা সম্ভব হত তাদের সাহায্য করতেন।

নিম্নের ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়–

হযরত ওসমান ইবনে মাসউন (রাঃ) একজন দরবেশ স্বভাব সাহাবী ছিলেন। তিনি সংসার বিরাগী জীবনযাপন করতেন। একদিন তার বিবি হযরত আয়েশা রাঃ-এর খেদমতে আসলে তিনি দেখতে পেলেন। তার শরীরে কোন প্রকার অলংকার এবং সাজসজ্জা নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলছেন, আমার স্বামী সারা দিন রোযা রাখেন এবং সারা রাত্রি নামাযে কাটান। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে তশরীফ আনয়ন করলে হযরত আয়েশা রাঃ কথা প্রসংগের হযরত ওসমান ইবনে মাসউনের ব্যাপারে তার কাছে উল্লেখ করলেন। ইহা শুনে হুজুর (সাঃ) হযরত ওসমান ইবনে মাসউনের কাছে তশরীফ নিয়ে তাকে বললেন, ওসমান আমাকে সংসার বিরাগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রকাশ করা হয় নাই। আমার জীবন পদ্ধতি কি অনুসরণযোগ্য বলে তুমি মনে কর না? আমি আল্লাহতায়ালাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করে থাকি এবং তার হুকম আহকাম সকলের চেয়ে অধিক পালন করে থাকি।

যারা নারী জাতিকে হীন মনে করত, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাদের প্রতি অতিশয় রাগান্বিত হতেন। কোন মাস'আলায় নারী জাতির হীনতার আভাস পাওয়া গেলে তিনি তা পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ করে মীমাংসা করে দিতেন। কোন কোন সাহাবী রেওয়ায়ত করেছেন যে, নারী, কুকুর এবং গাধা যদি কোন নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে যায়। তবে নামাযীর নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) উপরোক্ত রেওয়ায়েতের কথা শ্রবণ করে বললেন–

''তবে তো স্ত্রী জাতিও এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর জানোয়ার বিশেষ।'' ''তোমরা কেমন জঘন্য কাজ করেছ যে, আমাদিগকে গাধা ও কুকুরের সমান করে দিয়েছে। রাত্রিকালে নবী করীম (সঃ) নামাজ পড়তেন। আর আমি তার সম্মুখে শায়িত থাকতাম।'' ইহা তায়ালেসী কর্তৃক রেওয়ায়ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমিনীন বলছেন। হুজুর (সাঃ) সেজদা করার কালে আমার পায়ে চাপ দিতেন, আমি তার সেজদার স্থান হতে পা গুটিয়ে নিতাম। কোন কোন ফকীহ এ মত পোষন করেছেন যে, নারীর স্পর্শে পুরুষের ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি উক্ত ফকীহ সাহেবের ইজতেহাদী ভুল ধরে দিয়েছে।

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করলেন, ''তিনটি বস্তুর মধ্যে অশুভ লক্ষন বিদ্যমান আছে। ঘোড়া, ঘর ও নারী'' এই বর্ণনা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) খুব রাগান্বিতা হয়ে বললেন, 'সে মহান সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কুরআন অবতীর্ন করেছেন। হুযুর (সাঃ) কখনও এরুপ কথা বলেন নাই। তিনি এরুপ বলেছেন যে, অজ্ঞ যুগের লোকেরা এই তিনটি অশুভ লক্ষনের ফল গ্রহন করত।

স্ত্রী জাতি সংক্রান্ত বহু ফেকাহী মাস'আলায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন প্রকার মত পোষন করতেন। সে সমস্ত মাস'আলা সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) সর্বদা এমন মতই পোষন করতেন। কেননা নারী জাতির অসুবিধাসমূহ সম্বন্ধে তিনিই সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি তার অবলম্বিত মতের স্বপক্ষে কুরআন শরীফ ও হাদীস হতে প্রমান আনয়ন করতেন। ফলত পরবর্তী ফকীহগনের প্রায় সকলেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মতানুযায়ী ঐ সমস্ত মাস'আলার মীমাংসা প্রদান করেছেন। অধুনা মুসলিম জাতের অধিকাংশ দেশেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা হয়ে থাকে।

নিম্নোক্ত আরও একটি ঘটনা থেকে নারী জাতির মুক্তি প্রসংগে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কৃতিত্বের প্রমান পাওয়া যায়।

অজ্ঞ যুগে অবলা নারী জাতির কাধে কুসংস্কার ও কুপ্রথার লৌহ জিঞ্জিরের যে সব দুর্বহ গুরুভার চাপানো ছিল, তন্মধ্যে একটি প্রথা ইহাও ছিল যে, সেকালে তালাকের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না এবং তালাকের পরে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহনের কোন নির্দিষ্ট কালও ছিলনা।

পাষান হৃদয় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিত। যখন পুনঃ গ্রহনের কাল নিঃশেষ হওয়ায় নিকটবর্তী হত, তখন তাকে স্ত্রীরুপে পূন গ্রহন করত। তৎপর পুনরায় তালাক দিত। এরুপে সারাজীবন স্ত্রীকে এ প্রতারনার জাল হতে মুক্ত হতে দিত না। ফলে বেচারী চির দুঃখে আবদ্ধ হয়ে থাকত। কখনই যালিম স্বামীর জুলুমের কবল হতে মুক্ত হতে পারত না। কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদের উপর উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর শ্রেষ্ঠ ইহসান এই যে, তিনি তা' দিগকে অজ্ঞ যুগের এ অভিশাপ হতে চিরতরে মুক্ত করে দিয়েছেন। ইসলামী যুগে এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটল। মজলুম বিবি আশ্রয় গ্রহনের নিমিত্ত উম্মুল মুমিনীনের দরবারে দৌড়িয়ে আসল। তিনি এ মোকদ্দমা নবী করীম (সাঃ) এর সমীপে পেশ করলেন। এ ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়-

''যেই তালাকের পরে তাহলীল ব্যতীত তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহন করা যায়। উহা দুই তালাক। ইহার পরে হয় ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাকে স্ত্রীরুপে ঘরে রেখে দিবে অথবা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাকে বিদায় করে দিবে।'' (আল কুরআন)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহিলা সাহাবীদের যুগে হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ আলিমা, নারী শিক্ষার অগ্রপথিক এবং সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার যার প্রমান আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক পূর্নতা প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কামেল হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী জাতির মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত আর কেহই কামেল হয় নাই। আর সমগ্র নারী জাতির উপর আয়েশা (রাঃ) এর ফজীলত এরূপ যেমন সারীদ নামক উপাদেয় খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাদ্য বস্তুর উপর। বোখারী।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১ ও ২। মাওলানা নূরুর রহমান ''উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)'' পৃষ্ঠা নং-১

৩। মাওলানা নূরুর রহমান ''উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)'' পৃষ্ঠা নং-৫

* দ্রষ্টব্য ঃ মাওলানা নূরুর রহমান ''উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)'' পৃষ্ঠা নং-২৯-৩৬, ১৫৮, ১৫৯-১৬০, ১৭০, ১৭৮, ১৮৯, ২২১-২৩২, ২৫০-২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৫

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারী শিক্ষা ঃ

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন[১] আল্লাহর বানীর আলোকে মহানবী (সঃ) যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন প্রথমে তার সাহাবীদের এবং পরবর্তীতে ঐ খলিফাদের হাতে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। মহানবী সাঃ ইন্তেকালের পর যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ বলা হয়। এ যুগের চার জন খলিফার নাম হচ্ছে হযরত আবুবকর রাঃ, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান রাঃ, হযরত আলী (রাঃ)। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নতুন রাজ্য বিজিত হয়। বিজিত মুসলমানগণ ভিন্নতর শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেন এবং নতুন সমস্যার মুখোমুখি হন। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন অধিক অনুভূত হয়। তাই ধর্মীয় জ্ঞান, অনুশাসন, ও কুরআন হাদীসের নির্দেশ পালন ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী ভিত্তিক করা হয়। সে সাথে নারী শিক্ষার উপরও জোর দেয়া হয়। বিজিত অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয় এবং মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালূ হয়। তাই বলা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে এবং মহানবী সঃ এর সম্পর্কিত প্রতিটি কাজ দেখাশুনার পবিত্র দায়িত্ব পালনকল্পে খলিফাগণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছিলেন। সে সাথে নারী শিক্ষার ব্যাপারেও তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রনী।

শিক্ষাক্ষেত্রে হযরত আবুবকর রাঃ এর অবদান ঃ

হযরত আবুবকর রাঃ ইসলামের প্রথম খলিফা। শিক্ষা দীক্ষা চারিত্রিক মহাত্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। মহানবীর শিক্ষা জীবনাদর্শ ও গুনাবলীর অনুসারী হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তার খেলাফতকাল ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। এ স্বল্প পরিনানের খেলাফত কালে হযরত আবুবকর রাঃ কে ভন্ড নবীদের স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন প্রতিহত করতে হয়। তিনি শিশু রাষ্ট্রকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই তাকে ইসলামের ত্রানকর্তা বলে বিবেচনা করা হয়। দানশীলতা ও সত্যবাদিতার জন্য তিনি যথাক্রমে আতিক ও সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কুরআন ও হাদীসে অসাধারন জ্ঞানও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি মক্কার বিদ্বানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

মুইরের মতে, - ''মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক অটল ও স্থিরচিত্ত।

কুরআন সংরক্ষণ ঃ

ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজ শাহাদত বরন করলে তিনি হযরত ওমর রাঃ এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিতের মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবুবকর রাঃ এর মহান কাজ–ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

হযরত আবুবকর রাঃ নতুন নতুন মসজিদ স্থাপন করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক আলেম ব্যক্তিকে নিযুক্তিদান করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত আল্লার বানী পাথর, কাপড়, কাঠ, চামড়া ও পাতায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) সর্বপ্রথমে এগুলোতে সুবিন্যস্ত করায়ে মুসহাফ নাম দিয়ে নিজের কাছে রাখেন। -এসব কুরআন সংরক্ষনের তৎপরতা থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বড় রকমের অবদান ছিল তা বুঝা যায়।

জ্ঞান সাধনা ঃ

হযরত আবুবকর রাঃ ছিলেন একালে দ্বিতীয় বিজ্ঞতম ব্যক্তি। হযরত সঃ এর পরই তাঁর স্থান। তিনি কুরআনে হাফেজ ছিলেন। ইমাম সুয়ুতি তার তারিখ-উল খুলাফা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,

— তিনি ১৪২টি হাদীস বর্ননা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাসাউফ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

তিনি প্রথম ইজতিহাদ বিষয়ক নীতি নির্ধারন করেন এবং ফিকাহ্ সম্পর্কে অনেক কঠিন প্রশ্নোত্তর এবং স্বপ্নের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারতেন। তিনি নামাজের ইমামতি করার সময় খোতবায় শিক্ষামূলক আলোচনা করতেন এবং কুরআন শুদ্ধ করে পঠনের জন্য ক্বারী নিয়োগ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা তার আমলে আরও প্রসার লাভ করে। তিনি নারী শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তার মেয়ে হযরত আয়েশা রাঃ কে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। যার কারনে পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রাঃ নারী হয়েও নারী শিক্ষার উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ তিনি একধারে তাফসীর কারক, হাদীসবেত্তা, ফিকহ্ এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) লেখাপড়ার উন্নতির জন্য হযরত আবুবকর রাঃ এর অবদান সবচেয়ে বেশী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাঃ)র অবদান ঃ

খলিফা হযরত ওমর রাঃ (৬৩৪-৪৪খ্রীঃ) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হন। হযরত ওমর রাঃ ছিলেন সকল জ্ঞনের আধার।

তার আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসা তখন প্রসার লাভ করে। তিনি শিক্ষক গনকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে সেনানায়ক নিযুক্ত করে শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তখন মক্তবে কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে লিখন ও সাধারন অংক শিক্ষা দেয়া হত। লিখন শিখানো বাধ্যতামূলক করা হয়। বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ এবং আরবী সাহিত্য পাঠের প্রতি তিনি

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব দেন। কুরআনে সূরা বাকারা, মায়েদা, নূর প্রভৃতি এবং ধর্মীয় বিধান কানুন শেখা বাধ্যতামূলক করেন।

শিক্ষককে ভাষায় সুপন্ডিত হবার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন বিধায় তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা নেন। হাদীস শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কয়েকজন সাহাবীকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। ইসলামী আইন কানুন শেখানোর জন্য তিনি আবদুর রহমান ইবনে গলাম, আবুদারদা ইবনে জাবাল ও উবায়দা ইবনে সামেতকে সিরিয়ার এবং হযরত আম্মাসকে মিশরে প্রেরন করেন। হযরত ওমর রাঃ এর আমলে রাজ্যের বড় বড় শহরগুলোতে শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। মক্কা, মদিনা ছাড়াও কুফা, বসরা, দামেস্ক, ফুস্তাত প্রভৃতি স্থান শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করে।

একজন বিশিষ্ট ফকিহ হিসেবে তিনি ফতোয়া দিতেন। ফিকাহ ও ইসলামী আইন কানুন শেখানোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে নামকরা শিক্ষক প্রেরনের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাঃ শুক্রবারের খোতবায় হজ্ব সম্পর্কিত বিধান আলোচনা করতেন।তিনি বেদুঈনদের শিক্ষার ও ব্যবস্থা গ্রহন করেন। সুশাসক হযরত ওমর রাঃ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনগনের মধ্যে শিক্ষারও প্রসার ছাড়া ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না যা তাই তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। তার এসব শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মকান্ড থেকে জানা যায় তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারেও অত্যন্ত উদার ছিলেন।

নারী শিক্ষায় হযরত ওসমান রাঃ-র অবদান ঃ

নারী শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে হযরত ওসমান রাঃ এর যদিও কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকার স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। তারপরও তার শিক্ষা সম্পর্কীত কর্মকান্ড থেকে বুঝা যায়, তিনিও শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রনী ছিলেন।

হযরত ওসমান (৬৪৪-৬৫৬খ্রীঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আমলে তিনি অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় পবিত্র কুরআনের নির্ভুল ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাজের জন্য তিনি যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। হযরত আবুবকর কর্তৃক সংরক্ষিত মুসাফা, নানক কপি ও অন্যান্য লিখিত অংশ সংগ্রহ করে পবিত্র কুরআনের নির্ভুল সংস্করন তৈরী করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিতরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবং পবিত্র কুরআনের ত্রুটিপূর্ণ কপি পুড়ে ফেলা হয়।

হযরত ওসমান রাঃ রাজ্যের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু রাখেন। কুরআন হাদীস শিক্ষাদানের সাথে সাথে অংক, কাব্যচর্চা জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত তখন ধনী ব্যক্তিদের গৃহে কাব্য চর্চা ও কবিতা পাঠের আসর বসত। তিনি মদিনা মসজিদের সংস্কার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মান করে শিক্ষা প্রসারের সহায়তা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার হযরত আলী রাঃ এর অবদান ঃ

হযরত আলী রাঃ অসাধারন পান্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। তাই হযরত মুহাম্মদ সাঃ তাকে জ্ঞানের দরজা বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি যেসব অবদান রেখে গেছেন তা থেকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে, অগ্রসর ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায়।

খলিফা হযরত আলী রাঃ (৬৫৬-৬৬১খ্রীঃ) ছিলেন চতুর্থ খলিফা। ''বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল। বিত্তকে তুমি পাহারা দাও কিন্তু বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়। বিত্ত খরচে কমে যায়।'' বিদ্যা বিতরনে বেড়ে যায়। এ মূলাবান উক্তিটি হযরত আলীর (রাঃ) এর তিনি রাশেদীন আমলের সর্বশেষ খলিফা। যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তিনি আসাদুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন। সুশিক্ষিত হযরত আলী রাঃ একজন ওহী লেখকও ছিলেন। আরবী ব্যাকরন ও ন্যায়শাস্ত্রে তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। তার রচিত দেওয়ানে আলী আরবী সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। তিনি পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, ও সুরার ব্যাখ্যাদানে দক্ষ ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি পত্রের লেখক ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে। তার পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ব্যাকরন রচিত হয়। তার আমলে কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তিনি নিজেই এখানে শিক্ষার্থীদের কুরআন হাদীস শিক্ষা দিতেন।

হযরত আলী রাঃ একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম হাদীস লিখতে আরম্ভ করেন। তার হাদীস গ্রন্থ সহীফা নামে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ছিল ৫৮৬। তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। যুদ্ধ বিষয়ের উপর তার বহু কবিতা রয়েছে। তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রেরনা দানের জন্য দুই হাজারের ও বেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেন। হযরত আলী রাঃ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নীতি ও উপদেশ বিষয়ে তার বহু কবিতা আছে।

এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে হযরত আলী রাঃ অসামান্য অবদান রেখেগেছেন। যা নারী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছে।

তাই বলা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগ হচ্ছে ইসলামের সোনালী যুগ। এযুগ মসজিদ ভিত্তিক, মক্তব ভিত্তিক শিক্ষার যুগ এ আমলেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের সূত্রপাত হয় এবং আরবী ব্যাকরন রচিত হয়। পবিত্র কুরআনের শুদ্ধ সংস্করন প্রকাশিত হয়। শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রবর্তিত হয়। নারী শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না পাওয়া গেলেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে যে, তার উদার নীতির পরিচয় দিতেন সেটা জানা যায়। এসব মিলিয়ে শিক্ষার পথ সুগম হয় এবং পরবর্তী শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত হয়।

এ প্রসংগে ঐতিহাসিক Philip k. Hitte বলেন,- This was a period in which the histre of the prophet's life had not ceased to shed its light and

Dhaka University Institutional Repository

influence over the thoughts and acts of the caliphs. অর্থাৎ- ইহা এমন এক যুগ ছিল যে যুগ হযরতের (সঃ) জীবনাদর্শ খলিফাদের চিন্তাধারা ও কর্মের উপর আলো ও প্রভাব বিস্তার করা হতে বিরত হয় নাই।[১]

তথা সংগ্রহ ঃ

১। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং- ১৪, ১৫, ১৬, ১৭।

২। হাসান আলী চৌধুরী- ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা নং-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ নং-৬

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষা ঃ

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হয়। হযরত মুসায়েবের স্ত্রী আয়েশা বিনতে তালহা জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি বিশিষ্টতা লাভ করেন যে, একবার হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রী সাকীনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এত উচ্চ দরের সমালোচক ছিলেন যে, ফারাযদাকের মত কবিও তার প্রশংসা করেছেন। আব্দুল আজীজ ইবনে মারওয়ানের কন্যা এবং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের জ্ঞান প্রীতির কারণে তাদের বাড়ীতে জ্ঞানী, গুনী, কবি সাহিত্যিক এবং ফকীহদের আনাগোনা লেগেই থাকতো।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। অধ্যাপক আ, খা, আব্দুল মান্নান,

অধ্যাপক এ, কে, এম মোজাম্মেল হক,

অধ্যাপক ডঃ গোলাম রসূল মিয়া,

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইবনু ইনাম,

''শিক্ষার ইতিহাস''- পৃষ্ঠা নং-২৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ- ৭

আববাসীয় যুগে নারী শিক্ষা ঃ

উমাইয়া যুগের ন্যায় আবাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় সমান স্বাধীনতা ভোগ করত। আববাসীয় যুগের প্রথমভাগে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আববাস আস সাফহার স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদ মহিয়সী জুবায়দা প্রমুখ নারীগণ রাজকার্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব ঘটাতেন। হারুনের মহিয়সী জুবায়দা উচ্চ গুনসম্পন্ন কবি ছিলেন। মামুনের মহিয়সী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও লেখিকা। আববাসীয় আমলে ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব জননীদের উপর ন্যস্ত ছিল। মহিলাগণ সংগীত চর্চা করত এবং অন্যান্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করত।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। অধ্যাপক আ, খা, আব্দুল মান্নান,

অধ্যাপক এ, কে, এম মোজাম্মেল হক,

অধ্যাপক ডঃ গোলাম রসূল মিয়া,

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইবনু ইনাম,

''শিক্ষার ইতিহাস''- পৃষ্ঠা নং-২৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ- ৮

মোগল আমলে নারী শিক্ষা ঃ

ভারতবর্ষে মোগল বিজয় মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। তৈমুরের রাজকীয় পরিবারের উদ্যোগে শিক্ষার প্রতি নিয়মিত যে উৎসাহ প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা মুসলমানদের ভারত শাসনের ইতিহাসে বিরল বলা যায়। কারন এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যই প্রতিভাশালী, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হত। ফলে মুগল রাজদরবারে গোড়া থেকেই জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থলে পরিনত হয়। তখন সমগ্র মুগল রাজ দরবার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থল রূপে দেখা দেয় এবং সুনাম সমগ্র বর্হিবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

নিম্নে বিভিন্ন মোগল সম্রাটের আমলে নারী শিক্ষার অবস্থা কি ছিল সেটা তুলে ধরা হল-ঃ

সম্রাট হুমায়ুন ঃ

সম্রাট হুমায়ুন নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেষ্ট হন। উল্লেখ্য যে হুমায়ুনের সময় লিখিত জওহর আফতাবচীর লেখা ''তাজকেরাতুল ওয়াকিয়াত,'' ও গুলবদন বেগম রচিত ''হুমায়ূন নামা,'' গ্রন্থ দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। শাহজাদীদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য তিনি ইরান ও তুর্কী থেকে শিক্ষয়িত্রী এনেছিলেন যাদের ''আতুন'' বলা হতো। হুমায়ুন নিজে গল্প পদ্ধতির মাধ্যমে বোন গুলবদনকে লেখাপড়া শেখাতেন। আজকের দিনের মতো বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় না থাকায় রাজপ্রাসাদের বাইরে মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। মসজিদের ইমাম ছিল প্রধান শিক্ষক। পারিবারিক শিক্ষাই ছিল বড় শিক্ষা। শিক্ষা দান পদ্ধতি ছিল মৌখিক ও অনুশীলন। বোন গুলবদনের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি তার জন্য মিশর , ইরান, আরব ও তুর্কীস্থান থেকে বই সংগ্রহ করে এক বিশাল গ্রন্থাগার তৈরী করেন, যেখানে গুলবদন জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করতেন। তিনি মখফি এই ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করেন।

তিনি অত্যন্ত বিদূষী মহিলা ছিলেন। কবিতা লেখা ছাড়া ও তিনি হারেমের এতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও ধর্মশিক্ষা দিতেন। ফলে মোগল যুগে নারী শিক্ষার প্রসার শুরু হয়।

সম্রাট আকবার ঃ (১৫৫৬-১০৬৫ খ্রী:)

হুমায়ুনের পুত্র সম্রাট আকবরের আমলে নারী শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রমান পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল ফজলের মতে, শাহজাদা আকবরের দশজন ধাত্রী মাতার মধ্যে মাহম আনগা ছিলেন প্রধান ও শিক্ষিতা। ফলে আকবর সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে সম্রাট আকবর রাজকন্যা ও অভিজাত পরিবারগুলোর বালিকাদের জন্য ফতেপুর সিকরীতে তার রাজপ্রাসাদের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতে বুঝতে পারা যায় যে, মুসলমানদের উচ্চশ্রেনীর লোকেরা তাদের কন্যাদেরকে উচ্চশিক্ষা দেয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

সম্রাট জাহাংগীর ঃ (১৬০৫-১৬২৬)

সম্রাট আকবরের পর সম্রাট জাহাংগীর সিংহাসনে আরোহন করেন। শৈশবে তিনি অনেক গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহন করেন। এদের মধ্যে আবদুর রহিম খান আবদুল নবী, শেখ আবদুল্লাহ, নকীব খান,, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে জাহাঙ্গীর একদিকে যেমন ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন, অন্যদিকে গনিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিকথা, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও কথকতায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।

সম্রাাট জাহাংগীর যেমন একজন পন্ডিত ছিলেন তেমনি কবি হিসেবে ও তার খ্যাতি ছিল, বিদ্ধান সম্রাট জাহাংগীর শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এত উৎসাহী ছিলেন যে, সিংহাসনে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কতকগুলি বিলুপ্ত প্রায় মক্তব ও মাদ্রাসার সংস্কার সাধন করেন যেগুলো তিন দশক ধরে পশু ও পাখির বিচরন ক্ষেত্রে পরিনত হয়। সে সাথে নারী শিক্ষা প্রসারেও জাহাংগীরের আগ্রহ কম ছিল না। পর্দা প্রথার প্রচলন থাকায় নারী শিক্ষার সুযোগ কিছুটা স্তিমিত হলেও একেবারে থেমে যায়নি।

উল্লেখ্য যে, সাধারন নারী শিক্ষার সংকোচন হলেও বাদশাহর উচ্চশ্রেনীর এবং বিত্তবানদের জন্য মেয়েদের অন্দরে শিক্ষার ধারা অক্ষুন্ন ছিল। বিদূষী মহিলারা অন্দরে গৃহ শিক্ষিকার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তাদের মধ্যে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ছিল অন্যতম। আরবী, ফারসী, সাহিত্য তার অসাধারন বুৎপত্তি ছিল। অন্যান্য শাহজাদীদের মত তিনিও কবিতায় মখফি, ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে উপস্থিত কবিতা রচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তার ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি কবরে তার নিম্নলিখিত এ চরন উৎকীর্ন করার নির্দেশ দিয়ে যান-

''গরীব গোরে দীপ জ্বেলোনা,

ফুল দিও না কেউ ভুলে,

শামা পোকার না পোড়ে পাখ

দাগা না পায় বুলবুলে।''

মোগল আমলে নারীরা ধর্মীয় স্বচ্ছতার ব্যাপারে যে অধিক সচেতন ছিল উপরোক্ত চরন থেকে সেটা বুঝা যাচ্ছে। কবরে দীপ জ্বালানো এবং ফুল দেয়া ছিল শিরক সেটা তারা জানত। আর এটা তারা জেনেছিল লেখাপড়ার শেখার কারনে।

তাই সম্রাট জাহাংগীরের সময়ে নারী শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। সেটা তার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং রাজ্যের শিক্ষা বিস্তারে সামগ্রিক কর্মসূচী থেকে বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট জাহাংগীরের ভাল

Dhaka University Institutional Repository

বইয়ের প্রতি এতই অনুরাগ প্রবল ছিল যে, তার গুজরাট ভ্রমনের সময় তিনি সংগে করে নিজ ব্যবহারের জন্য এক খানা গ্রন্থাগার নিয়ে যান।

সম্রাট শাহ্জাহান ঃ (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ)

সম্রাট জাহাংগীরের পুত্র সম্রাট খুররম শাহজাহান নাম ধারন করে সিংহাসনে বসেন। বিখ্যাত পন্ডিত মোল্লা কাসিমবেগ তবরেজী, শায়খ আবুল খায়ের ও শায়খ সূফী তার গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন, ফলে যুগোপযোগী বিদ্যা লাভ করেন।

শাহ্জাহানের রাজত্বকালে সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অনেক বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তার দরবারের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন বাদশাহ লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী। শাহজাহান নামার লেখক উনায়ের খান, 'আমল সালিহ' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ সালিহ। আবুল কাসেম ইরানী এবং মির্যা জিয়াউদ্দিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ সভাকবি ছিলেন আবূ তালেব কলিম। এ ছাড়া 'মুনতাখাব-উল লুবাব', গ্রন্থের লেখক কাফী খান ও শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সে সাথে নারী শিক্ষার প্রতি সম্রাটের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

উল্লেখ্য যে, কানুন-ই-ইসলাম গ্রন্থথেকে জানা যায় মুসলমান মেয়েরা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত মক্তবে পড়াশুনা করতে পারত। তারপর তারা চার দেয়ালের মধ্যে বাস করত। এটা ছিল সাধারন সামাজিক ব্যবস্থা।

হেরেমের শিক্ষার জন্য বিশেষ উলেমা এবং চারুকলা শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিয়োগ করা হত।

রাজপরিবারের বহুনারী কেবল নিজেরাই শিক্ষিতা ছিলেন না, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ও ছিলেন। এমনি একজন নারী ছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল (আঞ্জুমান্দ বানুবেগম)। তিনি আরবী ও ফারসী লিখতে এবং চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। তারা নারী পরিচারিকাদের মধ্যে সদরুন্নিসা অত্যন্ত শিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনা ও রুচীবান ছিলেন।

মমতাজ মহল কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিত ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাকিম রুখনা-ই কাশী এবং সংস্কৃত কবি বংশীধর মিশ্র মমতাজ মহলের পৃষ্ঠপোষন লাভ করেন। তাছাড়া শাহজাহান কন্যা জাহানআরার মত এত উচ্চ শিক্ষিতা নারী সে যুগে খুবই কমই দেখা যায়। তিনি ''সিত্তি-উন-নেসা'' নামে আরবী, ফারসী জানা হেরেমের এক শিক্ষিতা বিধবার কাছে লেখাপড়া শুরু করেন। সিত্তি-উন নেসার বড় ভাই তালিবা-ই আমুলী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভাকবি ছিলেন। জাহানারা সূফী মতে বিশ্বাস করতেন। তিনি মুনিস-উল আরওয়া নামে ধর্মের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক গরীব মেয়েকে হেরেমে রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং মক্তব, মসজিদ সংস্কারের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দান করতেন। জাহানআরা বেগম নূরজাহানের মত তাঁর কবরের উপর তার লিখিত চরন উৎকীর্ণ করে দেয়ার জন্য বলে যান যা মানব জীবনে চির সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

''গৌরবের আবরনে

সজ্জিত করনা মোর সমাধিস্থল

মম সমাদীনা তরে অন্তিমের শ্রেষ্ঠসাজ

শ্যাম তৃণ দল।''

সম্রাট আওরংগজেব ঃ (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ)

সম্রাট শাহ্জাহানের পর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন অত্যন্ত মেধা শক্তি সম্পন্ন। তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে আওরঙ্গজেব বিভিন্ন বিষয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে পড়াশুনা করে নিজের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তিনি সমগ্র কুরআন শরীফ মুখস্ত বলতে পারতেন এবং ফারসী ভাষায় চিঠি ও নথি পত্র লিখতেন। তিনি ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং গদ্য রচনায় সক্ষম ছিলেন। তিনি যেহেতু বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন সেহেতু শিক্ষার প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাই অন্যান্য শিক্ষা বিস্তার সহ নারী শিক্ষার প্রতি সম্রাটের যথেষ্ট আগ্রহ ও সচেতন মনা ছিলেন। মেয়েরা প্রাথমিক পর্যায়ে অন্দর মহলে লেখাপড়া শিখতো। বিত্তশালী পরিবারে গৃহশিক্ষিকার মাধ্যমে হারেমের সন্নিকটে মক্তবে গিয়ে লেখাপড়া করত।

বালাকালে সম্রাটের মেয়ে জেবউন্নিসা তার দুই ফুফু জাহান আরা ও রওশন আরার কাছে শিক্ষা লাভ করেন পরে গৃহশিক্ষিকা মরিয়মের কাছে জেবউন্নিসা কুরআন পড়া শিখেন। ইনি হচ্ছে সম্রাট আলমগীরের সচিব এনায়েতউল্লাহ কাশ্মিরীর মাতা হাফিজা মরিয়ম। এ সময় তিনি আরবী ফারসী ওপরে অংক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পন্ডিত রুস্তম গাজী তার শিক্ষক নিযুক্ত হন, যিনি জেবউন্নিসার সুপ্ত প্রতিভাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন।

শাহী হারেমের শিশুদের জেবউন্নিসা কবিতা মুখস্ত করার জন্য আশরাফি উপহার দিতেন। এ থেকে তার কবিতা প্রীতির নমুনা বুঝা যায়। এ ছাড়া জেবউন্নিসা ছদ্মনামে আরবী ও ফারসীতে কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতা সংকলন দিওয়ান-ই মখফি নামে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে কবিতা যুদ্ধের আয়োজন করতেন। যা মুশায়েরা বলে খ্যাত। আর এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মোল্লা সাইফুদ্দীন আরদবেলী কুরআনের তাফসীর লিখে তার নাম দেন জেবউন্নিসা তফসীর। জেবউন্নিসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথি কেতাব ও পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিল্লীতে তার নিজস্ব গ্রন্থাগারে সংরক্ষন করতেন। তার এই গ্রন্থাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটক কবি, সাহিত্যিক পন্ডিত ব্যক্তিগন নিজেদের জ্ঞান পিপাসা মেটাতেন। জেবউন্নিসার চারপাশে যে সব কবি ছিলেন তাদের মধ্যে নাসির আলি ব্রাহমিন এবং বেহরাজ উল্লেখ যোগ্য। সে যুগে তিনি ছিলেন নারীকুলের গৌরব রবি। নুয়াজউদ্দিন মুহাম্মদ একজন ভাল কবি ছিলেন ও প্রকাশনা নিয়ে কাজ করতেন।

এ ছাড়া বাংলার সুবাদারদের আমলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। যার প্রমান বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গের স্ত্রী রুকেয়া বেগম তার বিদ্যাবত্তা ও গুনরাজির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কনরূপের শাসন কর্তারূপে নিযুক্ত তদীয় ভ্রাতা বাহরামের তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসন কার্যে তাকে সহায়তা দানের জন্য এবং মীর্জা নাহনকে অনুরোধ করে একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে তার শিক্ষা সংস্কৃতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নবাবগন এবং তাদের আমির ওমরাহ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন। এটা স্বাভাবিক যে, তারা তাদের কন্যাদের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করতেন। মহিলাদের কেউ কেউ তাদের শিক্ষা ও প্রতিভার গুনে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করেন এবং সে কালের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খানের কন্যা ও নবাব সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুন -নিসা বেগম ছিলেন এ রকম একজন প্রতিভাময়ী ও সংস্কৃতি-সম্পন্না মহিলা, যার প্রভাব তদীয় স্বামীর প্রশাসন কার্যে অনুভূত হত। সুজাউদ্দিনের কন্যা নাফিসা বেগম ও দারনামা বেগম সম্মানিতা মহিলা ছিলেন এবং সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল শিক্ষা লাভের কারনে।

সে যুগের উচ্চ শিক্ষিতা ও প্রতিভাশালিনী মহিলাদের মধ্যে আলিবর্দী খানের বেগম শরফুন নিসার নাম সর্বাগ্রগন্য। সমসাময়িক পারস্য দেশীয় ও ইউরোপীয় লেখকগন তার সুরুচি,সুশিক্ষা ও উদার ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নবাব স্বয়ং একজন বিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদিতে তার প্রতিভাময়ী সহ-ধর্মীনীর পরামর্শের প্রতি সম্মান দেখাতেন। শরফুন-নিসা তার প্রাসাদে বহু দরিদ্র ও পিতৃ মাতৃহীন অনাথা বালিকা এবং ক্রীত দাসীদেরকে শিক্ষাদান করেন ও তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। আলিবর্দীর কন্যা ঘষেটি বেগম (আসল নাম নেহেরুন নিসা) মায়মুনা বেগম ও আমিনা বেগম এরা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। স্বামী শাহামৎজঙ্গের মৃত্যুর পর ঘষেটি বেগম নবাব কতৃর্ক বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। শাহামৎজঙ্গ তার পিতৃব্যের রাজত্বের প্রারম্ভকাল থেকে উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতে দেখা যায় যে, ঘষেটি বেগম উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন। অন্যায়ে তাকে এ দায়িত্ব পূর্ন পদে নিয়োগ করা হত না-কারন দেওয়ানকে সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হত। আলিবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং আতাউল্লাহ খানের স্ত্রী রাবিয়া বেগম ছিলেন অন্য আর একজন মহিলা যিনি তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য খ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে লুৎফুন নিসার নাম সুপরিচিত। নারী শিক্ষার প্রসারে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমিনা বেগম যিনি ক্রীতদাসী বালিকাকে শিক্ষিতা করে তোলে এবং স্বীয় পুত্র সিরাজদ্দৌলার সংগে তার বিয়ে দেন। এ সব মহিলাদের জীবন থেকে প্রমান হয় যে, উচ্চ শ্রেনীর রমনীরা শিক্ষার সুযোগ পেতেন এবং শিক্ষা ও প্রতিভা বলে তারা ইতিহাসের আলোকে আসতে সমর্থ হতেন। উচ্চ শিক্ষার ফলে মুসলমান মহিলাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। শিক্ষা তাদেরকে সাহস ও মানসিক শক্তি সম্পদে বিভূষিত করে। ফলে দেখা যায় যে, ভাগলপুরের গাউস খানের বিধবা রমনী মারাঠা লুন্ঠনকারীদের আক্রমনের বিরুদ্ধে সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার গুনে স্বীয় গৃহ রক্ষা করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার নিয়মিত সুযোগ সুবিধার অভাবের দরুন মুসলমান বালিকাদের প্রতিভা প্রকাশ পেতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও পুরুষের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক প্রতিযোগিতায় নারীদের পান্ডিত্য ও কৃতিত্বের কথা শুনতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এর নজীর দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের মতে, হাসান হাটির কাজীর স্ত্রী হিন্দু শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। গদা মল্লিকার পুঁথি বা মল্লিকার হাজার সাওয়াল (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামেও অভিহিত বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নারী জনৈকা মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

বালিকা জ্ঞানের নানা শাখায় গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বিবাহের ক্ষেত্রে জ্ঞান কেন্দ্রিক শর্ত আরোপ করেন। যেটা হচ্ছে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন যে, যিনি তাকে সাহিত্য সংক্রান্ত বিতর্কে পরাজিত করতে পারবেন। তিনি তাকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। বহুযুব রাজ ও বিদ্বান ব্যক্তি তার সংগে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হন কিন্তু তাদের সকলেই পরাজয় বরন করেন। অবশেষে একজন সুফী পন্ডিত আবদুল হালিমগদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে তর্কে পরাজিত করেন। নয়িকা অতঃপর তার বিজয়ীকে বিয়ে করেন। যদিও এটা একটা গল্প মাত্র। তথাপি উহা সমাজের একটা অবস্থা তুলে ধরে যে, এরূপ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না রমনী বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিরল ছিলনা। কবি আবদুল হাকিমের আর এক খানা সমসাময়িক বাংলা গ্রন্থ (সায়ফুল মূলক) পুঁথি থেকে উক্ত ধারনার সমর্থন পাওয়া যায়। এই রম্য কাব্যের নায়িকা লালমতি সকল বিদ্যার পারদর্শিনী ছিলেন, এ ছাড়া উল্লেখ্য যে বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে জনৈক শিক্ষিতা মুসলমান রমনী মাধব বিবি ছিলেন বাউল মরমী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এই কিংবদন্তীর সত্যতা যাই থাকুক না কেন এতে অবশ্য প্রতিফলিত হয় যে, সে কালের মুসলমান সমাজে সুশিক্ষিতা ও সরুচি সম্পন্ন রমনীরা ছিলেন যারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং গুঢ়তাত্ত্বিক অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মোগল যুগে প্রায় সব সম্রাটের আমলেই নারী শিক্ষার দ্বার প্রশস্ত ছিল। সে যুগে নারীরা বাইরে না এসে অন্দর মহলে থেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা করত। তারা অন্দর মহলে গৃহ শিক্ষকের দ্বারা পড়াশুনা করত। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশ থেকে বই পত্র এনে দেয়া হত। এভাবে নারীরা জ্ঞান চর্চার সুযোগ পেত। মোগল আমলের অভিজাত পরিবারের মহিলারা সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং তাদেরকেহ কেহ, সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। তারা মূল্যবান গ্রন্থাবলী সংকলন করেন। প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন এবং ধর্মতত্ত্ব মরমীবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি লিখেন।

ফিরিস্তার মতে, মানবের সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হারেমে ১৫০০০ রমনী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী, সংগীতজ্ঞ, কুরআন তেলাওয়াতকারিনী প্রভৃতি মহিলাগন ছিলেন।

এ ছাড়া শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালী সুলতানগন, সুবাদার, নবাব এবং অভিজাত মহল তাদের কন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত গৃহ শিক্ষয়িত্রী রাখার মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরন করেন। মিঃ এডাম পান্ডুয়ায় ধনী ব্যক্তিগন কর্তৃক তাদের পুত্র কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন। কার্যতঃ এই রীতি বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ব্যাপক হারে প্রচলিত রীতিরই অব্যাহত ধারা ছিল। মিঃ এডাম মন্তব্য করেন যে, প্রতিবেশী গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের সে যুগের অবস্থাপন্ন মুসলমানগন কর্তৃক নিযুক্ত গৃহ শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভ করতে পারত। এভাবে মুসলমান বালিকারা গৃহে গৃহ শিক্ষক কিংবা গৃহ শিক্ষয়িত্রীর কাছে বিদ্যার্জনের সুযোগ পেত। যেহেতু এই বিশেষ ব্যবস্থা কেবল অবস্থা পন্ন ধনী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহনকারিনী বালিকাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে-বাংলাদেশে উচ্চ সম্প্রদায়ের মহিলারা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং-৫৩, ৫৪।

২। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং-৫৫, ৫৬।

৩। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং-৬১, ৫২।

৪। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং-৬৪।

৫। শিক্ষার ইতিহাস- পৃষ্ঠা নং-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ- ৯

মধ্যযুগে বাংলায় নারী শিক্ষা ঃ

খ্রীষ্টীয় এয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের কালসীমা চিহ্নিত। এই মধ্যযুগে বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের পদচারণা নাই বললেই ভুল হবে না। তবে গবেষনা দ্বারা যতদূর জানা গেছে সেই সময়ে চন্দ্রাবতী নামে এক হিন্দু ভদ্র মহিলা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনিই একমাত্র শিক্ষিত মহিলা ছিলেন যিনি রামায়ন রচনা করে গেছেন।

তার জন্ম ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের পাতোয়ারী গ্রামে। জীবন কাল ষোড়োশ শতাব্দীতে। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা ছিলেন। তার পরিচয় তার জীবনের দুঃখ কাহিনী বিষয়ক একটি গাঁথা থেকে জানা যায়। —

একই গ্রামের ব্রাহ্মন যুবক জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর সহপাঠি ছিলেন। তারপর পরস্পর পরস্পারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পরিনত বয়সে দুপাশের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিয়ে স্থির হয়। এমন সময়ে জয়ানন্দ এক মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে জয়ানন্দ ফিরে আসেন। কিন্তু জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুনন্দা নদীতে আত্মহত্যা করেন। চন্দ্রাবতী আর বিয়ে করেন নি। পিতা বংশীদাস কন্যার জন্য ফুলেশ্বরী নদীর তীরে একটি শিব মন্দির তৈরী করেন। তারপর থেকে তিনি শিব আরাধনায় সময় কাটাতে থাকেন। কিন্তু জয়নন্দের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই শোকাভিভূত চন্দ্রাবতীও দেহত্যাগ করে।

উপরোক্ত চন্দ্রাবতীর জীবনের দুঃখ কাহিনী ছিল তার সহপাঠিকে নিয়ে। তা থেকে বুঝা যাচ্ছে মধ্যযুগে অর্থাৎ সে সময়েও চন্দ্রাবতী প্রতিষ্ঠানিক ভাবে পড়াশুনা করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি রামায়ন রচনা করেছেন। এটা তার রামী কবিতার অনুবাদ। উল্লেখ্য যে, লৌকিক, মানবিক ও কিছু মৌলিক উপাদান সংযোগের ফলে এ রামায়ন কাব্যটি এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৩২ সনে চন্দ্রাবতীর এই রামায়ন প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তার রচিত কাব্য মলয়া। দস্যু কেনারামের পালা উল্লেখযোগ্য। তার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। এভাবে মধ্যযুগে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। বাংলা একাডেমী, চরিতাবিধান, পৃষ্ঠা নং- ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ- ১০

আধুনিক যুগে বাংলায় নারী শিক্ষা ঃ

আধুনিক যুগ বলতে ১৮০০ শতকের পর হতে অদ্যাবধি সময়কে বুঝানো হয়েছে। আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে বললে ভুল হবে না। এ যুগের কয়েকজন মহিলা যারা নারী শিক্ষায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাদের অধিকাংশ হচ্ছে কবি ও সাহিত্যিক। যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক হচ্ছেন যাদের অবদানে নারী শিক্ষার আকাশ আজও উজ্জল নক্ষত্রের মত দেদীপ্যমান, তাদের মধ্যে রহিমুননিসা, নবাব-ফয়জুন্নেছা, আজিজুন্নেছা, বেগম রোকেয়া, ফজিলাতুন্নেছা, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

একজন নারী শিক্ষিত হওয়া মানে নারী শিক্ষার পথকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তেমনিভাবে এসব নারী ব্যক্তিত্বরা বহুযুগ ধরে ঘুনে ধরা এ সমাজকে সংস্কার মুক্ত করার জন্য নিজেরা শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

এদের কর্মমুখর জীবনী থেকে নারী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিদের্শনা পাওয়া যায়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে নারী শিক্ষার এসব বিশেষ ব্যক্তিত্বদের অবদান তুলে ধরা হল।

নারী শিক্ষায় রহিমুন্নেছার অবদান ঃ [১]

আধুনিক যুগে রহিমুন্নেছা প্রথম মুসলমান শিক্ষিত মহিলা ব্যক্তিত্ব যিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন।

তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মোগল গাঁয়ের স্থানীয় ভাবে প্রখ্যাত জান আলি চৌধুরীর পুত্র আহমদ আলি চৌধুরীর পত্নী ছিলেন। ডঃ আহমদ শরীফের মতে, ''উনিশ শতকের প্রথম দিকে তার জন্ম।''

যুগ দূর্লভ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন তিনি। সে যুগের নারীদের মধ্যে বিরল কবি প্রতিভাও ছিল তার। তিনি মূলতঃ আত্ম জীবনী মূলক কাহিনী লিখেছেন। তার প্রমান পাওয়া গেছে রহিমুননিসার লিপীকৃত পদ্মাবতী এবং লায়লী মজনুর পান্ডুলিপিতে। এই পান্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে তার ''ভ্রাতৃবিলাপ ও দোরদালা'' বিলাপ নামের রচনা। এই রচনা দুইটিতে তার পিতৃ পরিচয়ের প্রমান মিলেছে। রহিমুন নিসার পিতার নাম আব্দুল কাদের। শৈশবেই তার পিতৃ প্রয়ান ঘটে। তার বিদূষী মা আলিমুন নিসা তাকে লেখাপড়া শেখান। পরে আবুল হোসেন নামের শিক্ষকের কাছে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। রহিমুন নিসার পিতাও কবি ছিলেন।

তার পিতাকে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং রহিমুন নেসাকে উনিশ শতকের প্রথম পাদের শেষে এবং দ্বিতীয় পাদের গোড়ার দিকে প্রাপ্ত বয়স্কা ও কবি রূপেই পাওয়া যায়। তিনি রূপজালালের কবি নওয়াব ফয়জুন নিসার বয়োজেষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, কালের দিক দিয়ে না হলেও মহিলা কবির রচনা বলেই তার প্রনীত কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

তাই রহিমুন নিসাকে কবি হিসাবে স্থায়িত্বভাবে স্বীকৃতি দেয়ার অভিপ্রায়ে বাংলা একাডেমী তার ত্রিপদী কবিতা গুলোকে সংকলন করে রেখেছেন।

প্রথম পদ	দ্বিতীয় পদ	তৃতীয় পদ
প্রনমিত্র নিরঞ্জন নিবেদিত গুনিপাদ	মনে স্মরি গুরুজন কর মোরে আশীর্বাদ	বর্নিতেছি দুঃখের বাসত দোভাব না হৌক মন
হীন মতি নেচাবর মোর পরে করতার	রহিমন্নিচা নাম মোর যতদিছে দুক্ষভার	শুন গুনী হই একমন সে সকল নাহাত্র কহন।
ফিরিল ভাগ্যের নিধি পূর্বজন্মে কৈলপাপ	বিমন হৈল বিধি সে দোষে ফলিল তাপ	আচম্বিতে শিরে বজ্রাঘাত আশা ভ্রষ্ট হৈলুম অনাথ
মিত্রের প্রানের প্রান তান পরে জগপতি	ভ্রাতৃমোর রূপবান গৌরব হইয়া অতি	নাম জান আবদুল ছাত্তার পাপ হন্তে করিল নিস্তার
আহা ভাই গুন সিন্ধু তোমার কৃতিরসীমা	রসিক জনের বন্ধু কি কহিমু সে উপমা	জ্ঞানের গুরু প্রেমের ওথার ধীর স্থির সত্য বস্তু সার
মিত্রের প্রানের প্রান	ভ্রাতৃমোর রূপবান	নাম তার আব্দুল গফুর

নারী শিক্ষায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর অবদান ঃ [২]

নারী শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে আধুনিক যুগে যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মহিয়সী, আজ নারী শিক্ষার জগতে প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত দীপ্তিমান হয়ে আছে নওয়াব ফয়জুন্নেছা তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নারী শিক্ষার জন্য মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের প্রায় দু'যুগ পূর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে ১৮৩৪ খৃঃ বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাও নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সুবিখ্যাত জমিদার আহমদ আলী চৌধুরীর উরসে এক ক্ষণজন্মা কালজয়ী মহীয়সী মহিলার জন্ম হয়। তার নাম ফয়জুন্নেসা। ১৮৬০ সালে কুমিল্লার বরুরা থানার বাউকসারের প্রতাবশালী জমিদার মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সাথে ফয়জুন্নেসার বিয়ে হয়।

নিজ গৃহ পারিবারিক পরিবেশে ফয়জুন্নেসার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে সম্ভ্রান্ত অভিজাত মুসলিম পরিবারসমূহের কানুনানুযায়ী ফয়জুন্নেসার পরিবারে উর্দু ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই আরবী উর্দুর সংগে অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত্ব করার কাজে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তার

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাষা শেখার আগ্রহ থেকে লেখাপড়ার প্রতি যে তার খুব ঝোঁক ছিল সেটা বুঝতে পারা যায়। তার ওস্তাদ তাজউদ্দিন আহমদের নিকট থেকে তার ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জানা যায় পর্দা প্রথার অন্তরালে থেকেও ফয়জুন্নেসা আরবী, উর্দু, ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পর্দা ফয়জুন্নেসাকে লেখাপড়ার পথ থেকে দূরে সরাতে পারেনি। সত্য কথা বলতে নারীদের শিক্ষার জন্য পর্দা কোন বাধা নয়। বরং পর্দার কারনে নির্বিশেষে নিশ্চিন্তে নারীরা চলাফেরা করতে পারে। যেমনটি করেছিল নবাব ফয়জুন্নেসা। পর্দা প্রথাই ইসলামে নারী শিক্ষার পথকে করেছে প্রশস্ত, যে পথ ধরে নারী শিক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ব বঙ্গের একটি রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহনকারী একজন মহিলা কিভাবে কেমন করে কোথেকে এ প্রেরনা লাভ করেছিলেন তা সহজে অনুমান করা দুঃসাধ্য।

উর্দু পরিবারে জন্ম নিয়েও তিনি বাংলায় কাব্যগ্রন্থ লিখে গেছেন। আজ থেকে ১১৮ বছর পূর্বে এই বিদূষী মহিলা ''রুপজালাল'' নামক বাংলা ভাষায় এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি একজন মহিলা কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। জানা যায় তার এ কাব্যগ্রন্থের একটি মুল কপি লন্ডনে ইন্ডিয়ান অফিসে লাইব্রেরীতে (বাংলা বিভাগ ক্রমিক নং১৪১৮) রক্ষিত আছে। ১৮৭৬ সালে ঢাকার গিরিশ মুদ্রন যন্ত্র থেকে তার ''রুপজালাল'' নামক কাব্য গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তারপর কুমিল্লার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক মরহুম আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের সম্পাদনায় ১৯৮৩ সালে গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া ''সঙ্গীত লহরী ও সঙ্গীতসার'' নামক দু'খানা গীতিকাব্য পুস্তিকা তিনি রচনা করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ''ইতিহাস গবেষক পুরাতত্ত্ববিদ মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলীর প্রচেষ্টায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা অপ্রকাশিত দুটি গানের পান্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়।''

ফয়জুন্নেসা একজন দানশীলা মহিলা ছিলেন। দানশীলতাই মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নবাব উপাধি লাভ করতে সক্ষম করেছিল।

এ ছাড়া তিনি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠার জন্য উদার হস্তে দান করতেন। এতে তার শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভুমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৪ খৃঃ নওয়াব ফয়জুন্নেসা পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার উদ্দেশ্য মক্কা শরীফ গমন করেন। তথায় অবস্থান কালে মক্কা শরীফে একটি মাদ্রাসা ও মদীনা মোনাওয়ারাতে একটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। মক্কা শরীফে মাদ্রাসায়ে সাওলাতিয়্যা ও ফুরকানিয়ায় মাসিক ৩০০টাকা ও মদীনা শরীফে মাসিক ১০০ টাকা সাহায্যের অঙ্গীকার করেন। জানা যায় দেশ বিভাগের পূর্বপর্যন্ত এ সাহায্য যথারীতি পাঠানো হত। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদেশে গিয়েও তিনি দান থেকে বিরত ছিলেন না।

বিদূষী জমিদার ফয়জুন্নেসা তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তার সে অবদাননূলক কাজগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৩ খৃঃ তিনি মহিলা শিক্ষার জন্য একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে সরকার বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহন করলে এর নাম হয় ফয়জুন্নেসা ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন একটি মুসাফির খানা ও মাদ্রাসা কিন্তু মাদ্রাসাটি পরে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিনত হয়। বর্তমানে এটা ফয়জুন্নেসা ডিগ্রী কলেজরূপে বিদ্যমান। ১৯০১ সালে তিনি তদীয়া কন্যা বদরুন্নেসা নামে বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসার প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের পরিমান আরো অনেক বেশী। তার এই দান দ্বারা সে তার জমিদারীর বিভিন্ন স্থানের প্রজাদের কল্যানে তিনি বহু মসজিদ, মক্তব, রাস্তা ও পুকুর নির্মান করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থদান বিরাট ভুমিকা রেখেছিল।

উল্লেখ্য যে,—১৮৯৯ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন কালে তিনি এতে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন।

তাই বলা যায় - ১৮৫৭ সালে বিপ্লবোত্তর যুগে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল নওয়াব ফয়জুন্নেসার কর্মবহুল জীবন। তখন ছিল ইংরেজ শাসন কর্তৃক মুসলমানদের উপর নিষ্পেষন আর ব্রাহ্মনাবাদী হিন্দুদের পুনরুত্থানের যুগ। সে যুগে শিক্ষার উন্নয়ন তথা নারী শিক্ষার উন্নয়নে সমাজসেবী, দানশীলা, ও উদার চিত্তের অধিকারিনী নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর অবদান চিরদিন অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

নারী শিক্ষায় বেগম আজিজুন্নেসার অবদান ঃ [৩]

নওয়াব ফয়জুন্নেসার পরে যে বিদুষী মহিলা নারী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করে গেছেন তার নাম হচ্ছে আজিজুন্নেসা। তার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি ইংরেজী জানতেন। সে সময়ে একজন বাঙালী মেয়ের পক্ষে ইংরেজী ভাষার দক্ষতা অর্জন করা সহজ কথা ছিল না। তার এ যোগ্যতা নারী শিক্ষার পথকে করেছে উৎসাহিত।

আজিজুন্নেসা একজন মহিলা কবি ছিলেন। আজিজুন্নেসার রচিত উদাসী কবিতা টমাস পার্নেল (১৬৭৯-১৭১৮) এর "The Hermit" কবিতার বঙ্গানুবাদ কবিতাটি বিশ্ব ইংরেজী পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কবিতা বাংলার প্রথম অনুবাদ করেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ১৮৫৭সনে এবং হরিনামে গুপ্ত ১৮৫৯ সনে। যদিও মুসলমান মহিলার লেখা প্রথম বই ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর রুপজালাল (ঢাকা) ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। তা সত্তেও আজিজুন্নেসার এই গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা অবশ্যই একটি উল্লেখ্যযোগ্য অবদান। তাই বলা যায় নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য বেগম আজিজুন্নেসার অবদান কম নয়।

নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান ঃ

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষায় যে কয়েকজন মহিয়সী মহিলা অনুল্য, অসামান্য, ও অসম্ভব অবদান রেখে গেছেন তন্মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদান সবচেয়ে বেশী। যিনি একাধারে কবি, বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী, প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক ছিলেন; যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলায় নারী শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তার জন্ম ১৮৮০ খ্রীঃ রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তার স্বামীর নাম সাখাওয়াত হোসেন। এদেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুসলিম নারী সমাজের জাগরনের জন্য তার অক্লান্ত সাধনা এদেশের অনগ্রসর নারী জাতিকে পথ দেখাতে সক্ষম করেছিল। তিনি নারী জাতির কল্যানের লক্ষ্যে নিজেকে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত করেন এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য তিনি লেখনি ধারন করেছিলেন। তার সব রচনাই সমাজ জীবনের বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত বলে বিবেচনা করা হয়। মতিচুর ও অবরোধবাসিনী তার লেখা গদ্যগ্রন্থ। তার রচিত উপন্যাসের নাম পদ্মরাগ, নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী ইত্যাদি সাহিত্যপত্রে তার বহুগল্প, কবিতা প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি সাহিত্যের উন্নতির জন্য অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে গেছেন, যা আজও পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি হচ্ছে রসনাপূজা, ঈদ সম্মিলন, সিসেমি ফাঁক, চাষার দুঃখ, এন্ডি শিল্প, রাঙা ও সোনা বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতি লুকানো রতন। রানী ভিকারিনী উন্নতির পথে, হজ্জের ময়দানে, নারীর অধিকার প্রভৃতি। আবার তিনি ছোটগল্প ও রস রচনা করেছেন। সেগুলি হচ্ছে ভ্রাতা-ভগ্নী, তিনকুড়ে, পরীবিবি, বিয়ে পাগলা বুড়ো ইত্যাদি।

মুসলিম নারী মুক্তির আন্দোলনে তিনি ছিলেন পথিকৃত। সেজন্য তিনি মনে করতেন নারীদের শিক্ষিত করা ছাড়া তাদের মুক্তি কখনই আসতে পারে না। তাই নারী শিক্ষার উন্নতি তথা নারী জাগরনের জন্য ১৯১০ সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমান্বয়ে সেটা উচ্চ ইংরেজী গালর্স স্কুলে উন্নিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন।মুসলিম নারী শিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্য কলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম, প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নেতৃত্বে এ সমিতি বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করে। নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তার মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তুলেছিল। তাই দেখা যায় বেগম রোকেয়া যে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন তার মধ্যে নারী জাগরনের প্রচেষ্টাই রুপায়িত হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি যে অনুপম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে সমলোচক আবদুল কাদির বলেছেন ''আধুনিক বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বেগম রোকেয়া নিজের পান্ডিত্ব বেদনার রসে সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলমান অন্তঃপুরে এহেন শানিতবুদ্ধি, প্রেম, পরায়নতা, রুচি সুন্দর প্রতিভার আর্বিভার এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মতে বিশ্বাসের অন্ধ উত্তেজনায় তিনি দুর্বল চিত্ততার পরিচায় দেন নাই।ইসলামকে তিনি মনুষ্যত্ব সাধনার এক চমৎকার আদর্শ রুপে গ্রহন করেছিলেন। তার চারপাশে যে সমাজ অবরোধবন্ধিনী নিগৃহীতা নারী সমাজ তারই অজ্ঞানতা নির্জীবতার বেদনা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই তো তিনি বলেছেন আমাদের এ বিশ্বব্যাপী দাসত্বের কারন কেহ বলতে পারেন কি? এই প্রশ্নের অন্তরালে যে দাহ তার তীব্রতা তার সমস্ত রচনায় সেটা সঞ্চারিত হয়ে আছে।''

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার অধ্যবসায় ছিল প্রবাদতুল্য। তার সাধনা ও ঐকান্তিকতার দৃষ্টান্ত মনে হয় এ দেশে বেশী নেই। ভাষা শিক্ষা ও বিদেশী ভাষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ওসব গুনের কথা বিশেষভাবে মনে আসে। দূর্লঙ্ঘ্য পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার আঘাতে অক্ষর জ্ঞানহীন হয়ে থাকাই সেকালে তার জন্য স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তানা হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন উর্দু ও ফার্সীর দক্ষ অনুবাদক। বাংলা গদ্যের একজন শিল্পী এতে জ্ঞান চর্চায় তার অসীম আগ্রহের পরিচয় মেলে এছাড়া তিনি ইংরেজী ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, যা ছিল তুলনাহীন আর এটা অর্জন করেছিলেন তার ভাই ইব্রাহিম সাহেবের কাছ থেকে। প্রসংগে তার উল্লেখাযোগ্য কৃতিত্ব নির্দেশ করে মিসেস পি,কে রায় মন্তব্য করেছেন -

"She was a very good writer in English but her English was done by hard study at home"[৪]

তার ইংরেজী রচনা হল will and perfect। অত্যন্ত সরস ও নিষ্ঠাপূর্ন অনুবাদও তিনি করেছেন ইংরেজী থেকে বাংলায়। এতে বাংলা ভাষায় তার দখলও ছিল বলে প্রমান করে। শুধু রোকেয়া সমসাময়িক কালে নয়। এ কালের তীক্ষ্নধর্মী সমালোচকের দৃষ্টিতে তার ইংরেজী বহুল প্রশংসিত ।

"Her English more or less self taught is lucid and ideomatic having none of the unnatural flambouyance which characterises non native English writings"[৫]

Sultana's Dream 1908 the Educational ideals of modern indian girls. নামক ইংরেজী রচনা দুটির ভাষায় প্রাঞ্জলতা এবং বিশুদ্ধতা পন্ডিত ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে। এই স্বশিক্ষিত নারীর ইংরেজী সম্পর্কে আবেগজনিত হয়ে স্বতস্ফূর্ত সাধুবাদ দিয়েছেন বাংলার এক বিশিষ্ট মনীষী শিখা গোষ্ঠির অন্যতম কর্নধার আবুল হুসেন।

Sultana's Dream সম্পর্কে তিনি বলেন, ''পুস্তক খানি যেরূপ সুমার্জিত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায়, লেখা সে রূপ ভাষা আয়ত্ব করা আমাদের অনেক ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কঠিন।''

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়ার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কলকাতায় ১৯১১ সনে স্বামীর স্মৃতি জাগরুক রাখার জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই বিদ্যালয়টি টিকিয়ে রাখতে বেগম রোকেয়াকে যথেষ্ট পরিশ্রম সহ সমাজের নানারকম প্রবঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি এমন একজন সাহসিক মহিয়সী নারী ছিলেন যে, নানা রকম দুঃখ কষ্ট নিজ জীবনে বরন করে নিয়েছেন। তবুও স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব থেকে দুরে সরে দাড়াননি। এ থেকে নারী শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তার যে ঔদার্য ছিল তার প্রমান মেলে। বিদ্যালয়টিকে তিনি যে কতটা ভাল বাসতেন তা খুলনাবাসী পাবনার এক পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইয়াসিনকে লেখা তার এক চিঠির বাক্য থেকে। চিঠিতে রোকেয়া লিখেছেন-

''আমি নিজেকে হতভাগ্য মনে করিনা। যদি কিনা আমার স্কুলটি সফল হয়, আর আমার মধ্যে যে সাহিত্যিক অভিলাষ আছে, সেটির বিকাশ ঘটাতে পারি।''

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে বেগম রোকেয়ার উপরোক্ত লেখা থেকে জানা যাচ্ছে স্বামীর মৃত্যুর পর ২টা জিনিসকে তিনি আকড়ে ধরেছিলেন। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে সাহিত্য সাধনা। আর অন্যটি হচ্ছে স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। তাই এখানে বেগম রোকেয়াকে নারী শিক্ষার একজন নিধার্থ অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি নিজের জীবনের চেয়ে সমাজের উন্নতি নিয়ে কত বেশী চিন্তা করতেন।

হতাশা ও অনিশ্চয়তা ছিল রোকেয়ার নিত্য দিনের অভিজ্ঞতা। তবু স্কুলটিকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে চলার সাধনায়ও বিরাম ছিল না তার।

নীচের হিসাব থেকে বুঝা যাবে, স্কুলের স্থান সংকুলানে কর্তৃপক্ষের দুঃখজনক অক্ষমতার দিকটি।

১৬ই মার্চ	১৯১১	সনে	ছাত্রী	৮ জন
''	১৯১২	''	''	২৭ জন
''	১৯১৩	''	''	৩০ জন
''	১৯১৪	''	''	৩৯ জন

এভাবে দৈন্য ও দূর্দশার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের নিমিত্তে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে আত্মনিয়োগ করে গেছেন এই মহিয়সী নারী, তাই তিনি সমাজের কাছে আজও নারী শিক্ষার একজন পথিকৃত হিসাবে পরিচিত। তার অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

এ প্রসংগে ''রাস সুন্দরী থেকে বেগম রোকেয়া'' বইয়ের লেখক গোলাম মুরশিদ বেগম রোকেয়ার চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সে কথা সত্যই প্রনিধানযোগ্য।

''সাফল্য এবং খ্যাতি সব সময়ে কর্ম নির্ভর নয়। কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ হয় নানা কার্যকারনে, খ্যাতি লাভে সম্ভাবনা ক্ষীনতর। বস্তু কাল এবং প্রতিবেশ এমনকি ভাগ্যের আনুকুল্য ছাড়া ব্যাপক স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত। সমকালের তুলনায় যার চিন্তা ছিল অত্যন্ত প্রাগ্রসর। কর্মবিমুখ সমাজে অষ্টপ্রহর যিনি সুকঠোর কর্তব্যরত, বাক্য এবং কর্মে যিনি অভেদ এমন একজন অসামান্য নারী হচ্ছেন বেগম রোকেয়া।''

সত্যিই বেগম রোকেয়া যে, যর্থাথই অসাধারন নারী ছিলেন এবং বহুদেশের নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনে এ শতাব্দীর সূচনায় তিনি যে, বিশেষ ভুমিকা পালন করেন একথা অনস্বীকার্য।''

নারী শিক্ষায় ফজিলাতুন্নেসার অবদান।[৭] (১৮৯৯-১৯৭৭)

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার অগ্রপথিক হিসাবে ফজিলাতুন্নেছার অবদান কম নয়। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। যিনি গনিতে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হন। তার

Dhaka University Institutional Repository

এমন অভূতপূর্ব ফলাফল-ই প্রমান করে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা অগ্রগামী ছিলেন। নিসন্দেহে এজন্য তিনি কৃতিত্বের দাবীদার।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। তার কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সেকালের কলকাতার বেকার হোষ্টেল সওগাত অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম ছাত্র সমাজ তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। এর পর তিনি নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কলকাতার বেথুন কলেজে গনিতের প্রভাষিকা হিসাবে যোগদানকরেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনি শিক্ষাবিদ ও কৃতীছাত্রী হিসাবে সেকালের মুসলমান সমাজে স্বনামধন্য ছিলেন। তিনি নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি সম্পর্কে শিখা, সওগাত, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করে গেছেন। তার লেখা রচনাগুলি হচ্ছে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (সওগাত, অগ্রহায়ণ-১৬৩৪) ''নারী জীবনের আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ'' (শিখা-১৩৬৫)।''মুসলিম নারীর মুক্তি'' (সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৬। মৃত্যু - ঢাকা ১৯৭৭ সনে।

ফজিলাতুন্নেসা এভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

নারী শিক্ষার কবি সুফিয়া কামালের অবদান ঃ [৮]

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার উন্নতিতে যে সব মহিয়সী বলিষ্ঠপূর্ন অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে সুফিয়া কামালের অবদান অপরিসীম। যিনি ছিলেন বেগম রোকেয়ার পর নারী আন্দোলনের অগ্রদূত, যিনি ছিলেন বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী, যার নিরলস প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সাহিত্য অংগন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে।

বেগম সুফিয়া কামাল বিংশ শতাব্দীর বিবেক, মননশীল ব্যক্তিত্ব মানব দরদী জননী কবি, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা। এই মহিয়সী নারীর জন্ম ১৯১১ সালের ২০শে জুন। তিনি নানার বাড়িতে মানুষ। সেকালে বনেদী পরিবারের মেয়েদের বাংলা শেখা এমনকি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহনের কথা কল্পনা করা যেতনা। তাই কবির ভাগ্যে স্কুলে পড়া জোটেনি। মায়ের কাছেই তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের প্রচন্ড উৎসাহে মামার লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে - তার বড় মামার লাইব্রেরী তাকে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরী করে দিয়ে-ছিল। কারন সেই লাইব্রেরীতে লুকিয়ে কবি জ্ঞান সাধনা করেছেন। তার এই জ্ঞান সাধনা তাকে সমাজের উঁচু তলার মানুষ হিসাবে দাড় করাতে সক্ষম করেছিল।

তিনি ১৯২৭-৩২ সাল পর্যন্ত এই ৬টি বৎসর বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম এর কাজে কলকাতার বস্তিতে মা শিশুর পাশে থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার পদাংক অনুসরন করে তিনি নারী সমাজকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। সেই থেকেই পথ চলা শুরু তার।

স্বামীর মৃত্যুর পর আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে থেকেও তিনি সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্য, নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং কাব্যিক অংগন থেকে দূরে সরে যায়নি।

সুফিয়া কামাল সারাটা জীবন সমাজের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে গেছেন। তিনি একাধারে ছায়ানট ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাত্রী উপদেষ্টা ও বাংলা একাডেমীর ফেলো ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তার বাড়িতেই কচিকাঁচার মেলার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ও রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদেরও তিনি সভানেত্রী ছিলেন।

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সৈনিক বধূ নামে ছোট গল্প প্রকাশের মাধ্যমে তার আত্ম প্রকাশ ঘটে। ১৯৩৮ সালে কাব্যগ্রন্থ সাঝের মায়া প্রকাশের পর কবি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পান। অজস্র লিখে গেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য। তিনি তার প্রতিভার জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫৯ সালে বুলবুল ললিত কলা একাডেমী দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু। এরপর তার কর্মের জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। শেষ পুরস্কার পান স্বাধীনতা পদক, রোকেয়া পদক ও সমাজসেবা পদক। সুফিয়া কামালের উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সাঝের মায়া, মায়াকাজল, কেয়ার কাটা। উদাত্ত পৃথিবী ইত্যাদি। তিনি গল্প ভ্রমনকাহিনী প্রবন্ধ ও স্মৃতি - কথা ইত্যাদিও লিখেছেন।

তাই বলা যায় সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত।

তিনি একটানা দশ বৎসর কলকাতার আলীনুদ্দীন কর্পোরেশনের স্কুলে চাকুরী করেছেন। এতে তার শিক্ষার ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৯৯৯ সনের ২০শে নভেম্বর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পরপারে চলে গেছেন।

উপরোক্ত মহিয়সীগন ছাড়াও আধুনিক যুগে বাংলায় অসংখ্য নারী সুশিক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় তারা ভবিষ্যতে নারী শিক্ষার উন্নতিতে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তবে তাদের সেই শিক্ষা ইসলাম নির্দেশিত পথে ও তার সঠিক এবং যথার্থ বাস্তবায়ন হতে হবে। তাহলেই নারীরা সত্যিকার অর্থে ইহকাল ও পরকালে মুক্তির দিশা খুঁজে পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১। ডঃ আহম্মদ শরীফ ''বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য'' পৃষ্ঠা নং ৯৮০-৮১।

২। সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম বাংলা একাডেমী চরিতা বিধান পৃষ্ঠা নং ২৩৭-২৩৮,ও মাসিক মদিনা ৯ম সংখ্যা-ডিসেম্বর ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ১৬-১৮।

৩। মোঃ আঃ কাইউম রত্নাবতী থেকে অগ্নিবীনা সমকালের দর্পনে, পৃষ্ঠা ১২।

৪। P.K Roy Begum Rokeya, The Amritabazar patrika (Calcutta 16, Dec, 1932) p.8.

5. Razia khan Amin, An Educational and worker. The Bangladesh obserer (Dacca, 9 Dec,1980) p suppli.

৬। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম ঃ পৃষ্ঠা নং ১১৭,. গোলাম মুরশিদ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া পৃষ্ঠা নং ১২৮, ১৪০.

৭। সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম বাংলা একাডেমী চরিতা বিধান পৃষ্ঠা নং ২৩।

৮। দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৯৯ ইং ২৯শে নভেম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

		পৃষ্ঠা নং-
১।	নারী শিক্ষার বিভিন্ন অন্তরায় ও সমাধানের ইঙ্গিত।	১৪৭-১৫৩
	উপসংহার	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারী শিক্ষার বিভিন্ন অন্তরায় ও সমাধানের ইঙ্গিত ঃ

ইসলামী শরীয়তে নারী শিক্ষা ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকরনীয় হিসাবে অনুমোদন করেছে এবং বর্তমান যুগের চাহিদা অনুপাতে এর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারনে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর জন্য অসংখ্য পারিপার্শ্বিক কারন দায়ী। তাই নারী শিক্ষার অগ্রসরের পথে কতগুলি অন্তরায় রয়েছে। নিম্নে সেগুলি প্রদত্ত হলো-

১। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ঃ-

পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে পুরুষদের অপেক্ষা হীন মনে করা হয়। পুরুষরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং নারীদের দন্ডমুন্ডের কর্তা মনে করে, তাই এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের নানারকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের শিক্ষার মত মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

২। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা ঃ-

মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার কারন। অভিভাবকরা পরিবার পরিজনের মৌল চাহিদা যেখানে পূরন করতে পারে না, সেখানে মেয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলার কথা চিন্তা করতে পারে না। -তাই দারিদ্রতার কারনে মেয়েরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ঃ-

সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও অজ্ঞ। নিরক্ষর জনগোষ্ঠির মাঝে মহিলাদের সংখ্যা বেশী। নিরক্ষরতার ফলে পুরুষ জনগোষ্ঠি যেমন মাতৃজাতির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদেরকে হীন মনে করে। তেমনি মহিলারাও তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ নয়। তারা বিশ্বাস করে যে, পুরুষের সেবার জনাই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে যে, শিক্ষা সহ নানা রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটা তারা বুঝে না। তাই বলা যায় নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাই নারী শিক্ষার পথে অন্যতম অন্তরায়।

৪। বুর্জোয়া মূল্যবোধ ঃ-

বুর্জোয়া মূল্যবোধের কারনে অধিকাংশ পরিবার মেয়েদের বাইরে যাওয়াকে লজ্জা ও মর্যাদা হানিকর মনে করে। তাদেরকে চার দেয়ালের গন্ডীতে আবদ্ধ করে রাখে। এর ফলে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫। অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন ঃ-

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যার যত বেশী ভূমিকা সেই সমাজে ততবেশী মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। এদেশের মেয়েদের গৃহস্থালী কাজের কোন মূল্য দেয়া হয়না। তাই তারা সমাজে গুরুত্বহীন। ১৯৮১ সনের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় গ্রাম বাংলায় ১০ বছরের উর্ধ্বে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ মহিলার মধ্যে মাত্র ১০ লাখ মহিলার গৃহের বাইরে কর্মসংস্থান ছিল। মজার ব্যাপার হল ঐ সময়ে ১ কোটি ৮৩ লাখ মহিলা গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন, যাদের কাজের কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয়নি। এভাবে নারীদেরকে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত রেখে তাদেরকে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ভাবে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে,তেমনি অন্যদিকে শিক্ষা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। যার কারনে নারী শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

৬। নির্ভরশীলতা ঃ-

মূলতঃ নারী সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক দূর্বলতার কারনে তাদের ভরন পোষন ও নিরাপত্তার জন্য আবহমান কাল থেকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধ্যকে পুত্রের উপর নির্ভরশীল। এ দূর্বলতার কারনে তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না। যার ফলে তারা শিক্ষিত রূপে গড়ে উঠতে পারে না।

৭। ধর্মীয় কুসংস্কার ঃ-

ধর্মীয় কুসংস্কার নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারনা না থাকায় তারা মনে করে ঘরের বাইরে যেয়ে লেখা পড়া করা ঠিক নয় এতে পর্দা নষ্ট হয়। এরুপ ধারনার জন্য মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বাইরে যেতে পারে না। অথচ ইসলাম পর্দা করে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করতে নিষেধ করেনি।

৮। যৌতুক প্রথা ঃ-

নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার অন্যতম আর একটি কারন হচ্ছে যৌতুক প্রথা। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত থাকায় মেয়েকে লালন পালন করার ব্যাপারে অভিভাবকরা অর্থনৈতিক দিকটা বিবেচনা করে থাকে। তারা মনে করে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সময় এমনিতে টাকা পয়সা খরচের প্রয়োজন পড়ে তারপর যদি তাকে শিক্ষিত করে তোলা হয়। তাতে আরও টাকার প্রয়োজন। এজন্য তারা তাদের মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখায় না। ফলে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়।

৯। লিঙ্গভিত্তিক অসমতা ঃ-

বর্তমান সমাজে ভবিষ্যতের উপার্জনকারী হিসাবে পুত্র সন্তানকে বেশী এবং মেয়ে সন্তানকে কম মূল্য দেয়া হয়। অভিভাবকরা মনে করে মেয়েদের পিছনে টাকা বিনিয়োগ করলে তাদেরকে তো তারা টাকা উপার্জন করে খাওয়াবে না। সেজন্য অভিভাবকরা মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠায় না। ফলে তারা লেখা পড়া থেকে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০। বাল্যবিবাহ ঃ-

বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাল্যবিবাহ আইন বিরোধী হলেও অধিকাংশ অভিভাবকেরা নানা কারনে মেয়েদের বিয়ে দেয়। তারপর তাদের বাকী জীবনটা স্বামীর বাড়িতে অশিক্ষিত থেকে কাটাতে হয়। এভাবে বাল্যবিবাহের কারনে মেধা থাকা সত্ত্বেও নারীরা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ফলে নারী শিক্ষার হার ক্রমে কমে আসছে।

১১। প্রেমে ব্যর্থতা ঃ-

প্রেম ও প্রেমে ব্যর্থতা নারী শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। আজ এই প্রেমঘটিত ব্যাপার সাধারনত: বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহপাঠিদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। প্রেম করতে গিয়ে কোন কারনে ব্যর্থ হলে মনমানসিকতা খারাপ হয়ে যায়, ফলে মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তদুপরি অভিভাবকরা যদি জানতে পারে তাহলে ঐ মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। তাই নারীরা এই প্রেমের কারনে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১২। অভিভাবকদের অশিক্ষা ঃ-

আমাদের সমাজের অধিকাংশ অভিভাবকরা অশিক্ষিত। তাই তারা লেখাপড়ার গুরুত্ব বুঝে না। সেজন্য মেয়েকে স্কুলে পাঠায় না। এর ফলে নারীরা অশিক্ষিত থেকে যায়। তাই বলা যায় অভিভাবকদের অশিক্ষা নারী শিক্ষার উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

১৩। সহশিক্ষা ঃ-

সহশিক্ষা নারী শিক্ষার উন্নতির পথে বাধা স্বরুপ। কারন সঠিক ভাবে ইসলামের অনুসারী অভিভাবকেরা পর্দার খেলাপ হবে বলে তারা তাদের মেয়েদেরকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে দিতে চায় না। এরফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও নানা কারনে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অথচ এই অর্ধেক জনসংখ্যার শিক্ষার উপর দেশের সামগ্রিক কাঠামোর উন্নয়ন ও উন্নতি নির্ভর করছে।

তাই আশা করা যায় নারী সমাজকে যদি সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়, প্রশিক্ষন দেয়া হয়, যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। তবে তারা পুরুষের মত দেশ ও জাতিগঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সেজন্য আশু ভিত্তিতে নারী শিক্ষার পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি দূর করতে হবে।

তাই নিম্নে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য সুপারিশ মালা প্রদত্ত হল।

Dhaka University Institutional Repository

১। পুরুষদের সচেতনতা ঃ-

ইসলাম নারী শিক্ষার ব্যাপারে যে উদার ও মহৎ দৃষ্টিভংগি প্রদান করেছে সেটা পুরুষদের জানতে হবে। এই পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা যদি ইসলাম প্রদত্ত নারী শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হয়, তাহলে নারীরা কখনও তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরে পাবে না। যার ফলে নারী শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

২। মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি ঃ-

নারী শিক্ষার উন্নতির অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হলে মৌলিক চাহিদা পূরনের সাথে সাথে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য সমাজের মানুষ চেষ্টা করবে। এর ফলে অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি যত্নশীল হবে। ফলে নারী শিক্ষার উন্নতি ঘটবে।

৩। বাল্য বিবাহ রোধ ঃ-

নারী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করতে হলে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে জনগনের দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এসম্পর্কিত মুসলিম পারিবারিক আইনকে কঠোর ভাবে কার্যকরী করতে হবে। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্যেও অনুরুপ আইন করে, বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের জন্য ২৫ এবং মেয়েদের জন্য ২২ বছর করতে হবে।

৪। ইসলামিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা ঃ-

ইসলাম শুধু নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম মানবিক মর্যাদায় আসীন করেছে তা নয়, বরং ইসলামে নারীর মর্যাদাকে পুরুষের তুলনায় সমুন্নতও করা হয়েছে। ইসলামের শাশ্বত বাণী মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।

অথচ সমাজের মানুষের ধারনা স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত। -তাই এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে এসব গোড়ামী দূর করে ইসলামের এ সুমহান আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নারী শিক্ষার উন্নতি দ্রুত সম্ভব হবে।

৫। আলেম শ্রেনী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের সচেতনতা ঃ-

নারী শিক্ষার উন্নতির ও অগ্রগতির জন্য এই তিন শ্রেনীকে বিশেষভাবে অবদান রাখতে হবে। কারন এরাই হচ্ছে সমাজের মধ্যমনি এদের প্রচেষ্টা থাকলে নারী শিক্ষা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ঃ-

নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। কারন সরকার যদি নারী শিক্ষার উন্নয়নের বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহন করে। তাহলে দ্রুতগতিতে নারী শিক্ষার উন্নতি সম্ভব।

৭। গণ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ঃ-

নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে হবে। রেডিও ও টেলিভিশনে যদি বিভিন্ন নারী বিষয়ক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং সংবাদ পত্রে বিভিন্ন তথ্য বহুল ফিচার লেখা হয় তাহলে সর্বস্তরের জনশক্তি নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ফলে মেয়েদের লেখাপড়ার হার বৃদ্ধি পাবে।

৮। মহিলা সংগঠন গুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকা ঃ-

দেশের মহিলা সংগঠন গুলোকে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে যে সমস্ত অন্তরায় সমূহ আছে সেগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। সে সাথে যে কাজগুলো করলে নারী শিক্ষার উন্নতি ঘটবে সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯। অভিভাবকদের সচেতন হওয়া ঃ-

অভিভাবকরা যদি মেয়েদের লেখাপড়ার গুরুত্বটা বুঝতে পারে অর্থাৎ তারা যদি সচেতন হয় তাহলে কোন পিতামাতার মেয়েই স্কুলে না যেয়ে থাকতে পারবে না। সেজন্য নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য অভিভাবকদের সচেতন হওয়া উচিত।

১০। স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঃ-

সহশিক্ষার পরিবর্তে নারীদেরকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় শিক্ষা গ্রহনের জন্য যদি স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহলে নারী শিক্ষার হার অনেক পরিমান বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী শিক্ষা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করবে।

এ ছাড়াও অন্যান্য সুপারিশ গুলো হচ্ছে-

১১। দারিদ্রতা বিমোচন করতে হবে।

১২. নারীদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষন দিতে হবে।

১৩। কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

১৪। মাতৃবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

১৫। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৭। সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

১৮। অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৯। গনমাধ্যম-গুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহনের সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২০। আইন গত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২১। যৌতুক প্রথা রোধ করতে হবে প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

''নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অবদান'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের উপসংহারে বলা যায় যে, নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের যে, মহৎ ও উদার অবদান রয়েছে তা যথার্থ প্রয়োজনীয়, যুগোপযোগী, এবং অত্যাধুনিক। ইসলামে নারী শিক্ষার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এবং বিশিষ্ট আলেমগনের দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে সাথে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সেই রাসুল সঃ এ যুগ থেকে শুরু করে আজকের পৃথিবীতে নারী শিক্ষার উপর যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, সেটাও আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামে নারী শিক্ষার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু দুঃখজনক যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষার পরিপন্থী। যার কারণে নারীরা শরীয়ত সম্মত পন্থায় শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান সমাজে অনৈসলামিক ভাবে মুসলিম মেয়েরা লেখাপড়া করছে বটে কিন্তু তারা সহশিক্ষা এবং নানা রকম অমার্জিত পরিবেশের কারণে তারা তাদের নৈতিকতা বজায় রাখতে পারছে না। যার কারণে ইসলামের আংগিকে নারী শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এছাড়া যে প্রধান কারণে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে সেটা হল ঃ ইসলামী সমাজের অনুপস্থিতি। মূলতঃ এই ইসলামী সমাজের অনুপস্থিতির কারণে নারী শিক্ষাকে বাস্তবে যথার্থরূপে রুপ দান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইসলাম নারীকে যে, একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিকশিত করার সুযোগ দিয়েছে সেটা ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ও পরিবেশের অভাবে তাদেরকে স্বতন্ত্র মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য বলা যায় ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালা কোন বাধা নয়। সমস্যা হল ইসলাম প্রদর্শিত নীতিমালার প্রয়োগ সমস্যা। অন্যদিকে একশ্রেনীর সংকীর্ণমনা আলেম ও ধর্মীয় গোড়ামীতে আবদ্ধ গোষ্ঠী ধর্মের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নারী শিক্ষার পথকে করেছে সংকুচিত। তবে বলা যায় নারী শিক্ষার পথে এত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও নারীরা যদি শরীয়ত সম্মত পন্থায় লেখাপড়া করার সুযোগ পায় তাহলে নারী শিক্ষা আবার ফুলে ফলে, পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে। যেমনটি হয়েছিল রাসূল সঃ এর যুগে।

তাই বলা যায় ইসলাম নারীকে দিয়েছে এক অপরুপ সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষা নামক ফুলের সম্ভার, যার গন্ধে দিশা হারা নারী জাতি যুগ যুগ ধরে তাদের সঠিক পথকে খুঁজে নিতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জী

1. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ''শফী''। পবিত্র কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) প্রকাশনায় খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প মদীনা মোনাওয়ারা কর্তৃক রাজকীয় সউদী সরকারের হজ্জ ও আওকাফ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশকাল ১৪১৩হিঃ।

2. ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নবী রিয়াদুস সালেহীন চতুর্থ খন্ড। প্রকাশনায় এ,কে নাজির আহমদ, পরিচালক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ সফর-১৪০৮ হিঃ অক্টোবর, ১৯৮৭ইং আশ্বিন ১৩৯৪ বাং।

3. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রাঃ) ও মাওলানা আজিজুল হক সাহেব ''বোখারী শরীফ'' প্রথম খন্ড, প্রকাশক আলহাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম হামিদিয়া লইব্রেরী লিমিটেড। দ্বাদশ সংস্করণ ১লা মার্চ ১৯৯৬ইং।

4. আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ ''রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা'' ইন্টারন্যাশন্যাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক ষ্টস, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, রমজান-১৪১৫।

5. অধ্যাপক আ,খা আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক এ,কে এম মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক ডঃ গোলাম রসূল মিয়া, অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইবনু ইনাম ''শিক্ষার ইতিহাস'' ঢাকা আহছানিয়া মিশন প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ইং

6. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী ''ইসলামী সমাজে নারী'' আধুনিক প্রকাশনী মহররম ১৪১৮জ্যৈষ্ঠ-১৪০৪, মে, ১৯৯৭ইং''

7. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান কাসেমী ''ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা'' আল আতহার একাডেমীর পক্ষে মুহাম্মাদ নেয়ামুল কারীম (মানসুর), ৬৩ কদমতলা, বাসাবো, ঢাকা- প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং, সাবান ১৪১৮হিঃ।

8. আবদুল খালেক ''নারী'' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ -জুন ১৯৯৫ইং, আষাঢ় ১৪০২ বাং, সফর ১৪১৬হিঃ

Dhaka University Institutional Repository

9. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) -'নারী জাতির সংশোধন' মোহাম্মদ ইমরান উল্লাহ মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা-১২১১, প্রথম প্রকাশ-জামাদুসসানী, ১৪১৭ হিঃ অক্টোবর, ১৯৯৬ইং।

10. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান ''সংগ্রামী নারী'' আধুনিক প্রকাশনী ১৫,শিরিসদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-প্রকাশকাল রবিউল আউয়াল-১৪১১, আশ্বিন-১৩৯৭বাং, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ইং।

11. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ''কুরআন সূত্র'' প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর-১৯৮৪ইং পান্ডুলিপি সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক গবেষনা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী।

12. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী-প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ন ১৩৮০। ডিসেম্বর ১৯৭৩।

13. মুহাম্মদ শামসুল আলম- ''রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য'' প্রকাশনায়-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক গবেষনা সংকলন ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ন ১৩৯৬বাং, ডিসেম্বর-১৯৮৯ইং।

14. আব্দুল হক- ''কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী'' প্রকাশক প্রকাশনায়-শামসুজ্জামান খান, পরিচালক গবেষনা সংকলন ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ন ১৩৯৩বাং, ডিসেম্বর-১৯৮৬ইং।

15. মাওলানা মুফতী আতাউর রহমান কাসেমী ''উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব'' প্রকাশনায় আল আতাহার একাডেমী, ঢাকা রবিউল আউয়াল ১৪১৯হিঃ, জুলাই ১৯৯৮ইং।

16. মূল হযরত মাওলানা হাকিম আলহাজ্জ মোহাম্মদ যাকারিয়া ''সাহাবা চরিত্র'' অনুবাদক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ১৫বাংলাবাজার, ঢাকা, জুন-১৯৯৬।

17. মুল-আল্লামা শিবলী নোমানী-অনুবাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, এম, এ ''আল ফারুক'' এমদাদিয়া লাইব্রেরী , চকবাজার, ঢাকা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং।

18. বেগম নার্গিস জেরীনা খান ''উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ'' প্রকাশনায় আব্দুল গফুর আলম বুক হাউস, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা।

19. মুফতী আব্দুল্লাহ ফারুক ''নারীদের সুন্দর জীবন'' আলিফ পাবলিকেশন্স ২/৩প্যারিদাসরোড, ঢাকা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ,১৯৯৮ইং।

Dhaka University Institutional Repository

20. ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী ''ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী'' প্রকাশনায় এ,কে,এম নাজির আহমদ, পরিচালক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। প্রথম সংস্করন ফেব্রয়ারী-১৯৯৮ইং।

21. লেখক মন্ডলী সম্পাদনা পরিষদ ''ফাতাওয়া ও মাসাইল'' প্রকাশক মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান পরিচালক গবেষনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩বাং, মুহাররম ১৪১৭হিঃ, মে ১৯৯৬ইং।

22. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ''বি. সি. এস ইসলামিক ষ্টাডিজ গাইড'' প্রকাশক মোঃ একরাম উল্লাহ দুলাল ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং

23. মাওলানা আবদুল হালিম ''সিদ্দিকে আকবর হযরত আবুবকর রাঃ'' এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রথম মুদ্রন ৫ই অক্টোবর, ১৯৮৮ইং।

24. মাওলানা নুরুর রহমান এম, এম; এফ আর-''উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাঃ'' এমদাদিয়া লাইব্রেরী। নভেম্বর-১৯৯৬ইং।

25. মুল হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)। অনুবাদ হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব (আল মুহাদ্দিছ) '' বেহেশতী জেওর'' ১ম খন্ড। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী-১৯৯১ ইং।

26. মাহবুবা বেগম '' নারীর ভূষণ'' প্রকাশক হাফিজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম প্রথম প্রকাশ রবিউল আউয়াল ১৪২০ বাং।

27. মুফতী হাবীব ছামদানী ''কুর'আন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা'' প্রকাশনায় নাছিমা বেগম, নর্থ সাউথ রোড, পূর্ব ধনিয়া, ঢাকা-প্রকাশকাল ১৯৯৯ইং।

28. অনুবাদকবৃন্দ সম্পাদনা ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ ''হযরত রাসূলে করীম সাঃ জীবন ও শিক্ষা'' প্রকাশনায় মুহাম্মদ নুফাজ্জল হুসাইন খান, পরিচালনায় গবেষনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ কাল-১৮৮৯ইং।

29. আল হাজ্জ মৌলভী মোঃ নূরুজ্জামান ''বেহেশতের রমনীগণ'' বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৯ইং।

30. কাজী আখতার আহমেদ ''যদি সাত সমুদ্র কালি হতো'' প্রকাশনায় মিসেস নিলুফার আহমেদ। গুলশান, সি, ই এন মুদ্রনে ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৪ইং।

31. মাওলানা নূরুর রহমান ''হযরত ওসমান (রাঃ) এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা প্রকাশকাল-আগষ্ট, ১৯৯৬ইং।

Dhaka University Institutional Repository

32. মূল হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) অনুবাদক - মাওলানা কারামত আলী নিযামী। ''ইসলামের দৃষ্টিতে নারী'' এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, জুন-১৯৯৪ইং।

33. মাওলানা নুরুর রহমান ''হযরত আলী (রাঃ)। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ-জুন ১৯৯৬ইং।

34. গোলাম মুরশিদ ''রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া'' প্রকাশনায় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশকাল- জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ বাং- মে ১৯৯৩ ইং।

35. মুফতী রুহুল আমীন যশোরী ''নারী জন্মের আনন্দ'' রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স, জামি'য়া রাহমানিয়া ভবন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। প্রথম প্রকাশকাল-জুলাই ১৯৯৮ইং ঈসায়ী।

36. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী '' পর্দা ও ইসলাম'' আধুনিক প্রকাশনী বাংলাবাজার, ঢাকা-রবিউল আউয়াল,১৪১৭হিঃশ্রাবন ১৪০৩, জুলাই ১৯৯৬ইং।

37. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ''পরিবার ও পারিবারিক জীবন''প্রথম প্রকাশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৮৩ইং।

38. হাফেজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম ''আল কুর'আনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত।'' প্রকাশনায় মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার। আর, আই . . পাবলিকেশন্স, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং।

39. রাজিয়া সুলতানা ''আব্দুল হাকিম কবি ও কাব্য'' প্রকাশনায় শামসুজ্জামান খান পরিচালক গবেষনা সংকলন ফোকালোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

40. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মোঃ জাকারিয়া (রহঃ) ''তাবলীগী নেছাব'' প্রকাশক মোহাম্মদ মাহবুব এ ইলাহী। তাবলীগী কতুবখানা, ৬০ নং চক সার্কুলার রোড, চকবাজার, ঢাকা। সংশোধিত সংকলন। ১১ইং নভেম্বর ১৯৯৪ইং।

41. মূল মাওলানা সয়ীদ আনসারী (রহঃ) ও মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী (রহঃ) ''মহিলা সাহাবীদের জীবন দর্শ'' প্রকাশনায় মাওলানা মাহমুদুল হাসান, নাদিয়াতুল কুর'আন প্রকাশনী, চকবাজার ঢাকা। মুদ্রনে মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস। ৪৯ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।

42. কে,এম,জি রহমান ''হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)'' প্রকাশনায় কাজী আনিসুর রহমান, তালতলা নোয়াখালী, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭৫ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

43. আব্বাসী আলী খান '' বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'' প্রকাশনায় এ কে নাজির আহমেদ পরিচালক বাংলাদে ইসলামিক সেন্টার। কাঁটাবন মসজিদ, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৪ইং।

44. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী '' ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস'' প্রকাশনায় মোঃ আইয়ুব আলী, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৭০ইং।

45. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুনশী ''মহিলা সাহাবীদের মসজিদে গমনাগমন ও ঈদের জমায়েতে যোগদান'' প্রকাশনায় সৈয়দ নুরুন নাহার পাবলী, ঢাকা। প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৮ইং, রমজান ১৪১৮ হিঃ, পৌষ ১৪০৪ বাং।

46. মাওলানা নূর মোহাম্মদ ''বেহেশতি মেওয়া বা আদর্শ স্ত্রী শিক্ষা'' প্রকাশনায় মোঃ আব্দুল কালাম। ৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯৮ইং।

47. হুমায়ান আজাদ ও আব্দুল হক ''সমাজ কল্যাণ পরিচিতি'' প্রকাশনায় মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, ২/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৭ইং।

48. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান ''কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন ইব্রাহীম বিন হারুন। আজীম প্রকাশনা, ব্লক-সি, মিরপুর, ঢাকা। প্রকাশকাল সাওয়াল ১৪১৮, পৌষ ১৪০৪, ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং।

49. অধ্যাপক আ, ন, ম আব্দুল মান্নান খান ও মুহাম্মদ কুরবান আলী ''ডিগ্রী ইসলামিক ষ্টাডিজ'' প্রকাশনায় মোহাম্মদ আইয়ুব আলী। আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ মে, ১৯৯৬ইং।

50. সম্পাদক মুহিউদ্দিন খান ''মাসিক মদীনা'' ডিসেম্বর ১৯৯৪ ৯ম সংখ্যা। পৃঃ ১৬, ১৮।

51. সম্পাদক আব্দুল মান্নান তালিব, নির্বাহী সম্পাদক এ, কে, এম নাজির আহমেদ ''পৃথিবী মাসিক পত্রিকা'' প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার জুন-১৯৯৫ সংখ্যা ৯।

52. ঐ ''পৃথিবী'' মাসিক পত্রিকা প্রকাশনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সংখ্যা ৭, বর্ষ ১৪। এপ্রিল ১৯৯৫।

53. ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ''মোগল যুগে স্ত্রী শিক্ষা'' ১৯.১৯ B 376.0 BRM.

54. ইকবাল শাহরিয়ার ''মোগল সমাজও রাজনীতিতে নারী'' B 954 .025. ১ম প্রকাশ ১৯৯৫।

55. আবুল ফাজিল ''নওয়াব ফয়জুন্নেছা'' B 92.70 ABN.

56. আব্দুর রহীম ''নারী'' ৯২০.৭ ABN আধুনিক প্রকাশনী ১৯৭৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

57. সম্পাদনা পরিষদ - খালিজা খাতুন ও অন্যান্য ''নারী ও উন্নয়ন প্রাসংগিক পরিসংখ্যান।'' 305.4 NAR.

58. সম্পাদনা - মেঘনা গুহ ঠাকুরতা - সুরাইয়া বেগম ''নারী রাষ্ট্রে উন্নয়ন ও মতাদর্শ।'' সমাজ নীরীক্ষন কেন্দ্র ১৯৯০, B 305.42 NAR.

59. আবুল কাসিম ''নওয়াব ফয়জুন্নেছা'' B 92 .70 ABN.

60. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারীবাদী গল্প সংকলন/অনুবাদ ও সম্পাদনা পূরবী বসুর ''নারী তুমি নিত্য'' প্রকাশ ১৯৯৩ ইং। B 891.44.308 NAR.

61. P.K. Roy Begum Rokeya. The Amritabazar patrika (calcutta 16 Dec. 1932) P.8.